বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা হাতে নারী মুক্তিযোদ্ধা

বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম

বীরপ্রতীক তারামন বিবি

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত ৪০০ শয্যার বাংলাদেশ হাসপাতালটি ভারতের আগরতলায় বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ হাসপাতালটি বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিল। ২ নং সেক্টরের অধীনে ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম এ হাসপাতালে কমান্ডিং অফিসার (সিও) ছিলেন। তিনি নিয়মিত ঝুঁকি নিয়ে আগরতলা থেকে ঔষধ আর দরকারি সরঞ্জামাদি আনার কাজ করতেন। গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধা অথবা অনাহার আর রোগে ভোগা শরণার্থীদের অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে মুমূর্ষু সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে গেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগমকে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কুড়িগ্রামের শংকর মাধবপুরে ১১ নম্বর সেক্টরে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা, তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, পাকিস্তানি বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা এবং সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধে শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয়, নানা কৌশলে শত্রুপক্ষের তৎপরতা এবং অবস্থান জানতে গুপ্তচর সেজে সোজা চলে গিয়েছেন পাক-বাহিনীর শিবিরে। দুর্ধর্ষ সেই কিশোরীর অসীম সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তারামন বিবিকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া
ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া
আরিফা রহমান
অনুপম বড়ুয়া
উৎপল চাকমা
শিপ্রা বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

সজীব কুমার দে

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনো আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সঙ্গে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে ধরা পড়লে এবং এর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী

নাম ____

বিদ্যালয় ____

তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এই নতুন বইয়ের মাধ্যমে তুমি বেশ কিছু সুন্দর ও মজার অভিজ্ঞতা পাবে। অভিজ্ঞতা পাওয়ার সময় কখনো বন্ধু, কখনো বাবা-মা, কখনো পরিবারের সদস্য, কখনো সহপাঠী বা শিক্ষক তোমার সহযোগী হবেন। কখনো একা একাও অভিজ্ঞতাগুলো লাভ করবে। তখন এই বই হবে তোমার একমাত্র বন্ধু।

তুমি যে অভিজ্ঞতা পাবে এবং যা জানবে, তা এই বইয়ে লিখে রাখতে ভুলবে না কিন্তু! তা হলেই এই বই হতে পারে তোমার তৈরি রিসোর্স বই।

শুভ কামনা রইল।

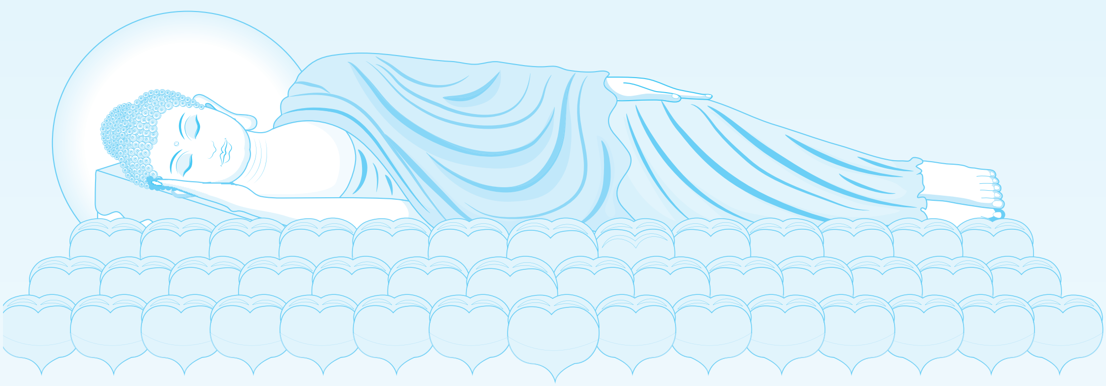

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় সূত্র পিটক	১ - ৮
দ্বিতীয় অধ্যায় সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান	৯ - ১৮
তৃতীয় অধ্যায় শীল: অষ্টশীল	১৯ - ২৫
চতুর্থ অধ্যায় আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ	২৬ - ৩৮
পঞ্চম অধ্যায় চরিতমালা	৩৯ - ৪৮
ষষ্ঠ অধ্যায় জাতক	৪৯ - ৫৮
সপ্তম অধ্যায় বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান	৫৯ - ৭০
অষ্টম অধ্যায় সূত্র ও নীতিগাথা	৭১ - ৮১
নবম অধ্যায় তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান	৮২ - ৯১
দশম অধ্যায় সম্প্রীতি	৯২ - ৯৯

প্রথম অধ্যায়

সূত্র পিটক

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব–

- সূত্র পিটক;
- সূত্র পিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি;
- সূত্র পিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

সূত্র পিটক : একদিন বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শান্তিকুঞ্জ বৌদ্ধ বিহারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভিক্ষু, শ্রমণ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষুকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সম্পর্কে দেশনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ত্রিপিটক সম্পর্কে তিনি বলেন, বুদ্ধ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ধর্ম সম্পর্কে বহু উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধশিষ্যগণ সেসব ধর্মোপদেশ সম্মেলনের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। সে সম্মেলনকে বলা হয় সঙ্গীতি। ধর্মোপদেশের প্রকৃতি বা ধরন অনুযায়ী বুদ্ধের বাণীগুলোকে তিনটি পিটকে সংকলন করা হয়েছে। তিনটি পিটক হলো : সূত্র পিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধর্ম পিটক। ত্রিপিটক বেশ কটি গ্রন্থের সমাহার। সম্পূর্ণ ত্রিপিটক সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। আজ আমি কেবল সূত্র পিটক সম্পর্কে আলোচনা করব। তিনটি পিটকের মধ্যে সূত্র পিটক সবচেয়ে বড়ো।

সূত্র পিটকের পাঁচটি ভাগ। যেমন :

ক) দীর্ঘ বা দীঘ নিকায়;

খ) মধ্যম বা মজ্‌ঝিম নিকায়;

গ) সংযুক্ত নিকায়;

ঘ) অঙ্গুত্তর নিকায় এবং

ঙ) খুদ্দক বা ক্ষুদ্র নিকায়।

বুদ্ধ সূত্র আকারে যেসব ধর্মোপদেশ দিয়েছেন, সেগুলো সূত্র পিটকের এই পাঁচটি নিকায়ে সংকলিত হয়েছে। এ কারণে এই পাঁচটি নিকায়কে একত্রে বলা হয়েছে সূত্র পিটক। আমি সূত্র পিটকের পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১

প্রথমে নিচের প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা করি, তারপর জোড়ায় আলোচনা করি এবং আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও ধারণাগুলো অন্যদের সামনে উপস্থাপন করি।

প্রশ্ন: কেন আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়া উচিত?

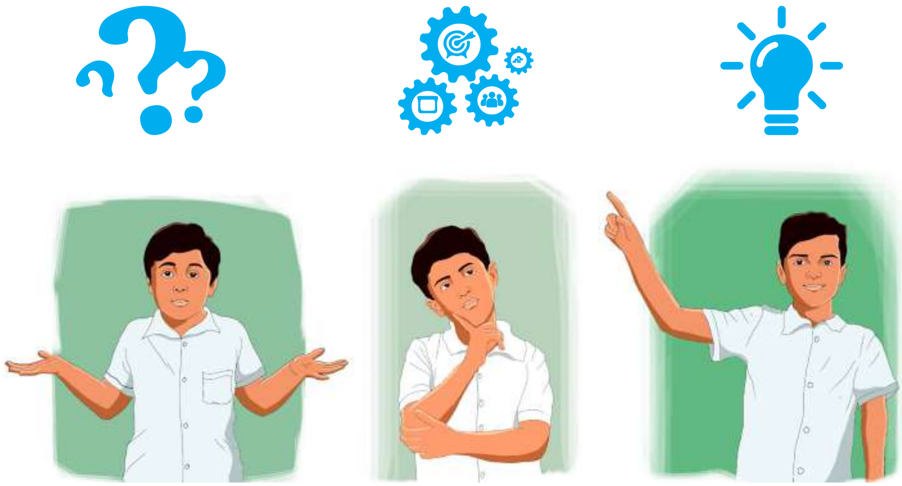

■ সূত্র পিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দীর্ঘ বা দীঘ নিকায় : সূত্র পিটকের প্রথম ভাগ বা নিকায় হচ্ছে দীর্ঘ নিকায়। বুদ্ধ দেশিত দীর্ঘ আকৃতির সূত্রগুলো এই নিকায়ে সংকলিত আছে। তাই এটিকে নাম দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ নিকায়। দীর্ঘ নিকায় তিনটি বর্গ বা খণ্ডে বিভক্ত। যেমন– শীলস্কন্ধ, মহাবর্গ ও পাটিক বর্গ। তিনটি বর্গে মোট চৌত্রিশটি সূত্র আছে। এর কিছু সূত্র গদ্যে, কিছু সূত্র পদ্যে রচিত। দীর্ঘ নিকায়ে সূত্রগুলোতে শীল বা নৈতিকতার কথা, মানব জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের কথা এবং বুদ্ধের জীবনের শেষ পর্যায়ের কিছু কথা আছে। এ সূত্র অমঙ্গল, অশান্তি এবং দুর্দশা থেকে পরিত্রাণের জন্য পাঠ করা হয়। এছাড়া বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের কথাও দীর্ঘ নিকায়ে পাওয়া যায়।

মধ্যম বা মজ্‌ঝিম নিকায় : সূত্র পিটকের দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে মধ্যম নিকায়। বুদ্ধ দেশিত মধ্যম আকৃতির সূত্রগুলো আছে বলে এটি মধ্যম নিকায় নামে পরিচিত। তিন খণ্ডে বিভক্ত মধ্যম নিকায়ে একশ বাহান্নটি সুত্র আছে। এখানে রয়েছে দান, শীল, ভাবনা, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এবং নির্বাণ সম্পর্কে আলোচনা।

এছাড়া, এ নিকায়ে সুন্দর জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

সংযুক্ত নিকায় : সূত্র পিটকের তৃতীয় ভাগ বা নিকায় হচ্ছে সংযুক্ত নিকায়। তুলনামূলকভাবে ছোট বা ক্ষুদ্র আকারের ছাপ্পান্নটি সূত্র সংযুক্ত নিকায়ে সংকলিত আছে। সূত্রগুলোতে তিন ধরনের বিষয়বস্তু রয়েছে; যেমন– নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক। বিশেষত শরীর, মন, পঞ্চস্কন্ধ, ধ্যান, সমাধি, চতুরার্য সত্য, শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয় এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে নৈতিক ও মানবিক নানা কাহিনি এবং পদ্যের মাধ্যমে। এছাড়া প্রশ্নোত্তর, উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমেও বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করা হয়েছে।

অঙ্গুত্তর নিকায় : সূত্র পিটকের চতুর্থ ভাগ হচ্ছে অঙ্গুত্তর নিকায়। গদ্যে ও পদ্যে রচিত এই নিকায়ে ছোটো-বড়ো ২৩০৮টি সূত্র আছে। এই নিকায়ে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, পঞ্চ উপাদান (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ), পঞ্চক্লেশ, পঞ্চনিবারণ, পঞ্চ ধ্যান, উপোসথ, মার্গ ও মার্গফল প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। এগুলো বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া, মানুষের বৈশিষ্ট্য, সমাজ জীবনে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পাপ-পুণ্য, কুশল-অকুশল কর্ম প্রভৃতি বিষয়ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

খুদ্দক বা ক্ষুদ্র নিকায় : সূত্র পিটকের শেষ ভাগ হচ্ছে খুদ্দক নিকায়। এ নিকায়ে ষোলটি গ্রন্থ আছে। প্রতিটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী ভিন্ন। ক্ষুদ্র বা ছোটো ছোটো বিষয়ের সমষ্টি বলেই এই নিকায়ের নাম রাখা হয় খুদ্দক নিকায়। এ নিকায়ের গ্রন্থগুলো হলো : ১. খুদ্দক পাঠ ২. ধম্মপদ ৩. উদান ৪. ইতিবুত্তক ৫. সুত্ত নিপাত ৬. বিমান বত্থু ৭. পেত বত্থু ৮. থেরগাথা ৯. থেরীগাথা ১০. জাতক ১১. মহানিদ্দেস ১২. চূল্লনিদ্দেস ১৩. পটিসম্ভিদা মগ্গ ১৪. অপদান ১৫. বুদ্ধবংসো ১৬. চরিয়া পিটক। নৈতিক, মানবিক, ত্যাগ, উদারতা, সহিষ্ণুতা, পরোপকার প্রভৃতি বিষয় খুদ্দক নিকায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান সমাজে গ্রন্থগুলোর যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। সূত্র পিটক সম্পর্কে বর্ণনা করার পর বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু বলেন, সূত্র পিটকের গ্রন্থগুলো পাঠ করলে অনেক সুফল লাভ করা যায়। নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত হয়। এরপর তিনি সূত্র পিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন।

■ সূত্র পিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সূত্র পিটক পাঠে বুদ্ধের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানা যায়। সূত্র পিটকে বুদ্ধ সূত্রগুলো কোথায়, কার কাছে এবং কী উদ্দেশ্যে দেশনা করেছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এছাড়া, সূত্রগুলোতে বুদ্ধের সময়ের রাজা ও রাজন্যবর্গসহ রাজ্যের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এ কারণে সূত্র পিটককে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া, সূত্র পিটকের সূত্রগুলো পাঠ করলে অর্জিত হয় নৈতিকতা, মানবিকতা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সংযম, ধৈর্য প্রভৃতি গুণ। সৌহার্দ, সম্প্রীতি এবং পরোপকারের মনোভাব জাগ্রত হয়। হিংসা, লোভ, বিদ্বেষ, তৃষ্ণা প্রভৃতি

থেকে মুক্ত থাকা যায়। নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠন এবং নির্বাণ লাভে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য সূত্র পিটকের সূত্রগুলো পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

সূত্র পিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করার পর বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করে আলোচনা শেষ করেন। উপস্থিত সবাই মনোযোগ দিয়ে তাঁর ধর্মালোচনা শোনেন এবং সাধুবাদ দিয়ে অনুমোদন করেন। শিক্ষার্থীরা পরদিন ক্লাসে এসে শিক্ষককে বললেন, আলোচনা সভা থেকে আমরা সূত্রপিটক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। শিক্ষক তাদের প্রশংসা করেন এবং ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২

নিচের কিউআর কোড (QR Code) স্ক্যান করে ওয়েবসাইট থেকে ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো সম্পর্কে জানো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩

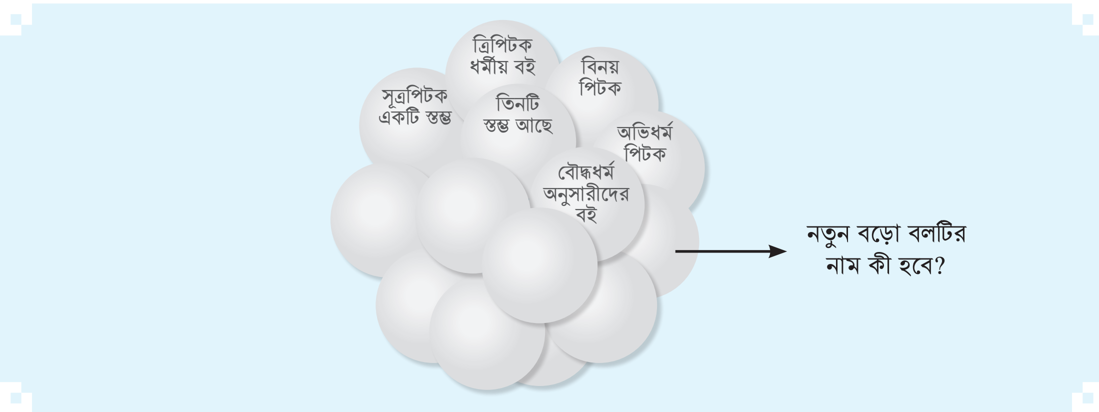

সূত্র পিটক সম্পর্কে তোমার নতুন জ্ঞানের একটি বড়ো তুষার বল তৈরি করার জন্য উপযুক্ত চিন্তাগুলো বৃত্তে লেখো। তুষার বল হচ্ছে এমন একটি ধারণা, যেখানে অসংখ্য ছোটো ছোটো তুষার বলের সমন্বয়ে বড়ো একটি তুষার বল তৈরি হয়। এজন্য উপরের ছবিটি দেখো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪

এই অধ্যায় পড়ার পরে নিচের প্রবাহ চিত্রটি সম্পূর্ণ করো (শূন্যস্থান পূরণ করার মতো)।

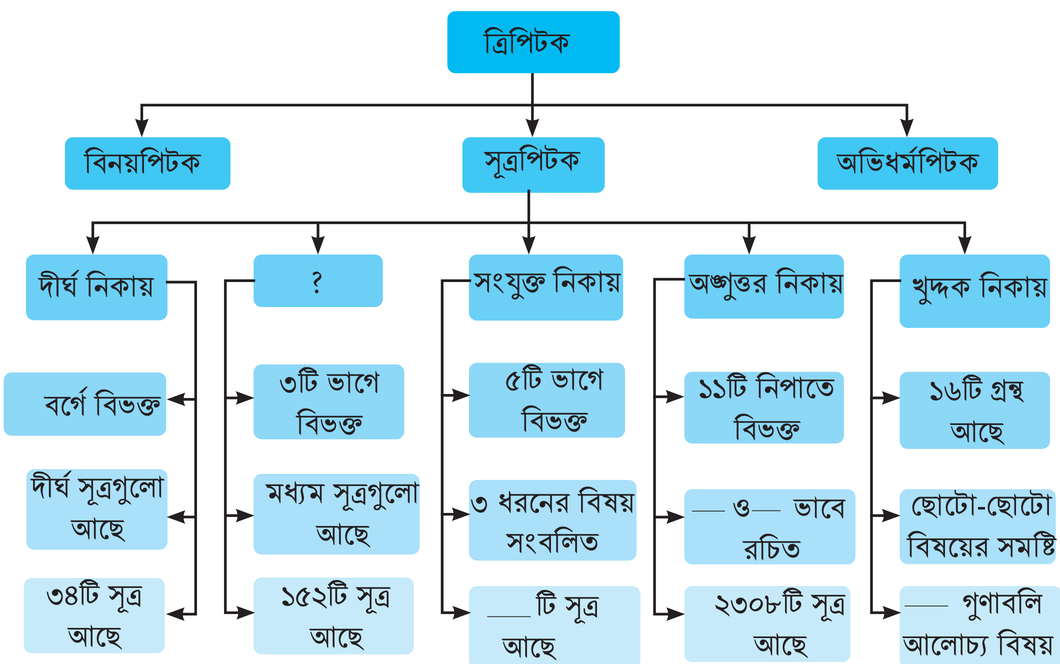

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫

বই পড়া ও তথ্য অনুসন্ধান অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম : বই পড়া ও তথ্য অনুসন্ধান

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)

-
-
-
-

কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)

-
-
-
-

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

-
-
-
-

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)

-
-
-
-

ফিরে দেখা : নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না ঘরে (✔) চিহ্ন দাও :

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
১		
২		
৩		
৪		
৫		

কয়েকজন ভিক্ষু ও শ্রমণ ত্রিপিটক পড়ছেন

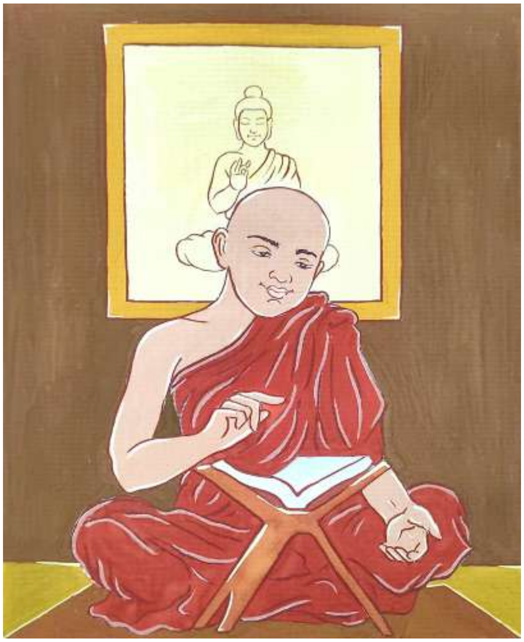

সবাই মিলে সূত্র পিটক পড়ি, নৈতিক ও মানবিক জীবন গড়ি।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব–

- সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান;
- সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান কেন করা হয়;
- সংঘদানের নিয়মাবলি;
- সংঘদানের সুফল;
- দানানুষ্ঠানের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব।

একদিন সুজন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। সেই সময় বাল্যবন্ধু বিদেশ ফেরত মহিউদ্দিন তার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। দীর্ঘদিন পরে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কুশল বিনিময় এবং আপ্যায়নের পর সুজন মহিউদ্দিনকে বললেন, দুই বছর আগে আমার বাবা মারা গেছেন। আগামী মার্চ মাসের ১৫ তারিখ বাবার উদ্দেশে অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদান করব। তা নিয়ে আমি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। মহিউদ্দিন এ সম্পর্কে জানার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সুজন তাকে বললেন, বৌদ্ধরা নানা রকম ধর্মীয় দান অনুষ্ঠান পালন করেন। এর মধ্যে সংঘদান অন্যতম। সংঘদান করার সময় অনেকে অষ্টপরিষ্কার দানও করেন। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা দান করে থাকেন। একেক দানের ফল একেক রকম। এরপর তিনি মহিউদ্দিনকে অষ্টপরিষ্কার ও সংঘদান কী, কেন করা হয়, এ দানের নিয়ম, সুফল এবং গুরুত্ব প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। প্রথমে তিনি সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান কী এবং কেন করা হয় তা বর্ণনা করেন।

সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান

‘সংঘ’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন– দল, সমিতি, সভা, পরিষদ, ইত্যাদি। ভিক্ষুসংঘ বলতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দল, সভা, সমাগম, পরিষদ ইত্যাদি বোঝায়। বৌদ্ধধর্ম মতে, পাঁচ বা তার বেশি ভিক্ষুর দল, পরিষদ বা সমাগমকে বলা হয় সংঘ। সংঘদান অনুষ্ঠানে ভিক্ষুসংঘকে আমন্ত্রণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধাচিত্তে প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা হয়। তাই এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় সংঘদান। ত্রিপিটকে উল্লেখ আছে যে, একজন ভিক্ষুকে দান দেওয়ার চেয়ে সংঘকে দান দেওয়া খুবই ফলদায়ক। যে কোনো সময় সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, দায়ক-দায়িকা যে কেউ একক বা সমবেতভাবে বিহারে বা ঘরে সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন। সাধারণত উপাসক-উপাসিকা, দায়ক-দায়িকাবৃন্দ নিজ গৃহে সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

বৌদ্ধরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপলক্ষ্যে সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিয়ে, নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু, বিদেশ ভ্রমণ, তীর্থযাত্রা, নবজাতকের জন্ম, প্রব্রজ্যা গ্রহণ প্রভৃতির আগে সংঘদান করা যায়। তবে পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার সদ্‌গতি ও মঙ্গল কামনায় অবশ্যই সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। এটি বৌদ্ধের একটি সামাজিক প্রথা। এছাড়া, পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেও সংঘদান করা যায়। সংঘদান অনুষ্ঠানে ভিক্ষুসংঘের পাশাপাশি আত্মীয়স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদেরও আমন্ত্রণ করে উত্তম খাদ্যদ্রব্যে আপ্যায়ন করা হয়।

সংঘদান অনুষ্ঠানে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য এবং আহারের উপযোগী যে কোনো দ্রব্য দান করা যায়। যেমন– খাদ্যদ্রব্য, চীবর বা পরিধানের বস্ত্র, ওষুধ, লাঠি, ছাতা, সুঁই-সুতা, বই, খাতা, কলম-পেন্সিল, আসবাবপত্র, তোষক ইত্যাদি। কিন্তু অষ্টপরিষ্কার দানে আট প্রকার নির্দিষ্ট দ্রব্য দান করা আবশ্যক। 'অষ্টপরিষ্কার' শব্দের অষ্ট অর্থ হলো আট, আর পরিষ্কার-এর অর্থ হলো পরিষ্কার করার উপকরণ। ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় আটটি নির্দিষ্ট উপকরণ বা বস্তু যে দান অনুষ্ঠানে ভিক্ষুসংঘকে দান করা হয় তাকে অষ্টপরিষ্কার দান বলে। অষ্টপরিষ্কার দানের আটটি দানীয় সামগ্রী হলো : সংঘাটি, উত্তরাসংঘ, অন্তর্বাস, পিণ্ডপাত্র, ক্ষুর, সুচ-সুতা, কটিবন্ধনী ও জলছাকুনি।

সংঘদান এককভাবে আয়োজন করা যায়। অষ্টপরিষ্কার দান সাধারণত সংঘদানের সঙ্গে আয়োজন করা হয়। অষ্টপরিষ্কার দানের অনেক সুফল রয়েছে। অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদান করলে আরও বেশি পুণ্য অর্জিত হয়। তাই বর্তমানে অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদান আয়োজনের প্রচলন লক্ষ করা যায়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬

কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে সংঘদান করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করো।

গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৭

সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দানের দানীয় সামগ্রীর একটি তালিকা তৈরি করো (দলীয় কাজ)

সংঘদানের দানীয় সামগ্রীর তালিকা	অষ্টপরিষ্কার দানের দানীয় সামগ্রীর তালিকা
১	১
২	২
৩	৩
৪	৪
৫	৫
৬	৬
৭	৭
৮	৮

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান বর্ণনা করার পর সুজন মহিউদ্দিনকে সংঘদানের নিয়মাবলি বর্ণনা করেন।

সংঘদানের নিয়ম

সংঘদান অনুষ্ঠানের আগে ভিক্ষুসংঘকে ফাং বা নিমন্ত্রণ করতে হয়। সংঘদানে ভিক্ষুর সংখ্যা যত হয় তত বেশি ভালো। সংঘদানে বিভিন্ন বিহারের ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। সাধ্যমতো আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। অনুষ্ঠানের দিন বিহারে বা বাড়ির আঙিনায় সুন্দরভাবে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। ভিক্ষু ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য সাজানো হয় পৃথক বসার আসন। ভিক্ষুদের আসনের সামনে দানীয় সামগ্রী সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। ভিক্ষুসংঘ আসন গ্রহণ করার সময় উপস্থিত সবাই সাধুবাদ দিয়ে স্বাগত জানান। ভিক্ষুসংঘ, দায়ক-দায়িকা বা অতিথিগণ আসন গ্রহণের পর শুরু হয় সংঘদানের কাজ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য ভিক্ষুসংঘের মধ্য হতে বয়োজ্যেষ্ঠ (বর্ষাবাস গণনায়) একজন ভিক্ষুকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সভাপতির নির্দেশনা অনুসারে চলে দান অনুষ্ঠানের কাজ। উপস্থিত দায়ক-দায়িকার পক্ষ হতে একজনকে প্রথমে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়। তারপর সভাপতি বা তাঁর নির্দেশে অভিজ্ঞ একজন ভিক্ষু পুনরায় ত্রিশরণসহ সংঘদান গাথা তিনবার আবৃত্তি করেন। গাথাটি এ রকম–

ইমং ভিক্খং সপরিক্খারাং ভিক্ষু সংঘস্স দানং দেম পূজেম
দুতিয়ম্পি ইমং ভিক্খং সপরিক্খারাং ভিক্ষু সংঘস্স দানং দেম পূজেম
ততিয়ম্পি ইমং ভিক্খং সপরিক্খারাং ভিক্ষু সংঘস্স দানং দেম পূজেম।

গাথার বাংলা অনুবাদ : আমরা এই প্রয়োজনীয় উপকরণ ভিক্ষু সংঘকে দান দিয়ে পূজা করছি। উপস্থিত সকলে গাথাটি সমস্বরে তিনবার আবৃত্তি করেন।

অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদান করা হলে অষ্টপরিষ্কার দানের উৎসর্গ গাথা আবৃত্তি করে সেই দানীয় সামগ্রী দান করতে হয়।
ভিক্ষুর সঙ্গে অষ্টপরিষ্কার দানের উৎসর্গ গাথা তিনবার আবৃত্তি করতে হয়। গাথাটি নিম্নরূপ :

ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারাং ভিক্খুসংঘসস্ দেম পূজেম
দুতিযম্পি ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারাং ভিক্খুসংঘসস্ দেম পূজেম
ততিযম্পি ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারাং ভিক্খুসংঘসস্ দেম পূজেম।

গাথার বঙ্গানুবাদ : আমরা এই প্রয়োজনীয় অষ্টপরিষ্কার (আট প্রকার উপকরণ) ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়ে পূজা করছি।

দ্বিতীয়বার ....

তৃতীয়বার ....

এরপর, ভিক্ষুসংঘ সমস্বরে বিভিন্ন সূত্র পাঠ করেন। বিশেষত, করণীয় মৈত্রী সূত্র, মঙ্গালসূত্র, রতনসূত্র, অঙ্গুলীমাল সূত্র, আটানাটীয় সূত্র, বোজ্ঝঙ্গ সূত্র প্রভৃতি। সূত্র পাঠ শেষ হলে উপস্থিত দায়ক-দায়িকা বা অতিথি সাধুবাদ প্রদান করেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

তারপর একজন গৃহী পুণ্যানুমোদন গাথা আবৃত্তি করেন। তাঁকে অনুসরণ করে উপস্থিত দায়ক-দায়িকারা গাথাটি তিনবার আবৃত্তি করেন। পুণ্যানুমোদন গাথা আবৃত্তিকালে দাতার পরিবারের একজন জল ঢেলে পুণ্যরাশি মৃত জ্ঞাতিসহ সকল প্রাণী ও দেবতার উদ্দেশে দান করেন। গাথাটি এ রকম–

১	ইদং মে (বো) ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো (তিনবার)
২	উন্নমে উদকং বট্টং যথা নিন্নং পবত্ততি, এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি (তিনবার)
৩	যথা বারিবহা পুরা পরিপুরেন্তি সাগরং, এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি (তিনবার)
৪	এত্তাবতা চ অমহেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং, সব্বে দেবা অনুমোদন্তু সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া এত্তাবতা চ অমহেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং সব্বে সত্তা অনুমোদন্তু সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া এত্তাবতা চ অমহেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং সব্বে ভূতা অনুমোদন্তু সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া
৫	আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা, পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু সাসনং। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা, পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু দেসনং। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা, পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু মং পরং।
৬	ইমেনা পুঞ্ঞকম্মেন মা মে বালা সমাগমো, যতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বানপত্তিয়া। ইদং মে পুঞ্ঞং নিব্বান পচ্চয়ো হোতু'তি, আসবক্খয়াবহং হোতু।

বাংলা অনুবাদ

১. এই দানের দ্বারা সঞ্চিত পুণ্য আমাদের জ্ঞাতিগণের হোক। এর দ্বারা আমার জ্ঞাতিগণ সুখী হোক। (তিনবার)

২. জল যেমন উঁচু স্থান হতে গড়িয়ে নিচের দিকে যায়, তেমনি মনুষ্যলোক হতে জ্ঞাতিগণের প্রদত্ত পুণ্যরাশি প্রেতগণের উপকার করে।

৩. জলপ্রবহমান নদীগুলো যেমন ক্রমে সাগর পরিপূর্ণ করে, তেমনি এখান হতে জ্ঞাতির প্রদত্ত দানময় পুণ্যরাশি পরলোকগত প্রেতদের উপকার করে।

৪. এই যাবৎ আমরা যে পুণ্যসম্পদ সঞ্চয় করেছি, তা সমস্ত সম্পত্তি সিদ্ধির জন্য দেবতা, সত্তা ও প্রাণিগণ অনুমোদন বা সাদরে গ্রহণ করুন। (তিনবার)

৫. আকাশবাসী, ভূমিবাসী দেব এবং নাগগণ এই পুণ্য সম্পদ অনুমোদন করে চিরকাল লোকশাসন, বুদ্ধশাসন, প্রজ্ঞাপ্তধর্ম, দেশনাধর্ম, আমাকে এবং অপর প্রাণীকে সকল প্রকার উপদ্রব হতে রক্ষা করুন।

৬. আমি নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত আমার সঙ্গে যেন অসৎ ব্যক্তির সংশ্রব না ঘটে, এই পুণ্য আমার নির্বাণ লাভের হেতু হোক।

যথাযথ নিয়মে দান শেষ হওয়ার পর ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাবারে আপ্যায়ন করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে যাতে কোথাও কোনো ত্রুটি না হয় সেজন্য বয়োজ্যেষ্ঠরা পুরো কার্যক্রম তদারকি করেন। ভিক্ষুসংঘের আহারের পর পরিবারের পক্ষ থেকে দানীয় সামগ্রী, দক্ষিণা এবং পাথেয় শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দনাসহ ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করা হয়। ভিক্ষুসংঘ আশীর্বাণী দিয়ে তা গ্রহণ করেন এবং কিছু উপদেশ, পরামর্শ ও উপস্থিত সকলকে আশীর্বাদ দিয়ে স্থান করেন। ভিক্ষুসংঘ যাওয়ার সময় উপস্থিত সকলে সমবেতভাবে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা নিবেদন করে শ্রদ্ধা সহকারে বিদায় জানান। ভিক্ষুসংঘ চলে যাওয়ার পর নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আহার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের দিন পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের মিলন ঘটে। প্রত্যেকে পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৮

সংঘদানের প্রক্রিয়াটি সবাই মিলে ভূমিকাভিনয় করে উপস্থাপন করো। (ঐচ্ছিক)

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৯

তোমার দেখা একটি অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদান অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লেখো (একক কাজ)। অনুগ্রহ করে ক্লাস শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

সুজনের আলোচনা শুনে মহিউদ্দিন খুশি হলেন এবং সংঘদানের সুফল সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন সুজন তাকে একটি দান কাহিনিসহ সংঘদানের সুফল বর্ণনা করেন।

সংঘদানের সুফল

বুদ্ধ সংঘদানের ফল সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন,

> পঠবী সাগরো মেরু খয়ং যন্তি যুগে যুগে
> কপ্পানি সতসহস্সানি সংঘে দিন্নং ন নস্সতি।

অর্থাৎ ‘‘যুগে যুগে পৃথিবী সাগর, মেরু প্রভৃতি ক্ষয় হয়ে যায়, কিন্তু শত সহস্রকল্পেও সংঘদানের দ্বারা অর্জিত ফল বা পুণ্যরাশি শেষ হয় না।”

অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদানের সুফল আরও তাৎপর্যপূর্ণ। অষ্টপরিষ্কার দানের ফলে দাতা জন্ম-জন্মান্তরে ধনশালী, ভোগশালী ও রূপশ্রীমণ্ডিত হয়। যশ-খ্যাতির অধিকারী হয়। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হয়। নানা শাস্ত্র ও শিল্পকলায় দক্ষ হয়। দেবগণ দ্বারা আপদে-বিপদে রক্ষিত ও সম্মানিত হয়। রোগহীন, নির্ভীক ও বিশুদ্ধ দেহপ্রাপ্ত হয়।

এরপর, সুজন মহিউদ্দিনকে সংক্ষেপে একটি দান কাহিনিও বর্ণনা করেন।

পূর্ণা নামে এক দাসী ছিলেন। তিনি দরিদ্র হলেও দান করতে খুবই পছন্দ করতেন। একদিন গৃহকর্ম করার পর তিনি ক্লান্ত শরীরে পুকুর ঘাটে বসে আহার গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে সময় একজন বৌদ্ধভিক্ষু ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে পূর্ণার খাবারগুলো দান করার ইচ্ছা হলো। কিন্তু রুটিগুলো ছিল আধপোড়া। ফলে তিনি ইতস্তত বোধ করছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি ভিক্ষুর নিকট গিয়ে বন্দনা নিবেদনপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ভন্তে! আমার কাছে দুটি আধপোড়া রুটি আছে। আমি আপনাকে তা দান করতে ইচ্ছুক।’

আপনি কি আমার এ দান গ্রহণ করবেন? তখন ভিক্ষু বললেন, বিত্তের চেয়ে চিত্ত সম্পদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভিক্ষুর কথা শুনে পূর্ণা আশ্বস্ত হলেন এবং শ্রদ্ধাচিত্তে ভিক্ষুকে রুটিগুলো দান করলেন। ভিক্ষু আনন্দ চিত্তে সেই রুটি গ্রহণ করলেন। এই দানের ফলে পূর্ণা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দানের সুফল জেনে মহিউদ্দিনের দান সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। এরপর, তিনি দানের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব বর্ণনা করার জন্য সুজনকে অনুরোধ করেন। সুজন তাকে দানানুষ্ঠানের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

■ সংঘদানের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব

বৌদ্ধদের কাছে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি হিসেবে সংঘদানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যদিও ধর্ম বিষয়টি আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকতা হলো লৌকিক। মানব জীবনে ধর্ম ও সামাজিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক নিয়েই বৌদ্ধরা এগিয়ে যায় পরম লক্ষ্যে। বৌদ্ধদের প্রধান লক্ষ্য নির্বাণ লাভ করা। আর দান হলো নির্বাণ লাভের প্রথম সিঁড়ি। উত্তম এবং মঙ্গল কাজসমূহের মধ্যেও দান অন্যতম। দান একটি মহৎ গুণ। এর বিকাশে সংঘদান অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং মানুষকে নীতিবান ও শীলবান হতে উদ্বুদ্ধ করে। এতে অংশগ্রহণ করলে দানের অভ্যাস গড়ে ওঠে; দয়া, উদারতা এবং পরোপকারী মনোভাব সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, কৃপণতা, লোভ-দ্বেষ-মোহ, অহংকার প্রভৃতি দূর হয়। গৌতম বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে অসংখ্য দান করে দান পারমীসহ দশ পারমী পূর্ণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

সংঘদানে ভিক্ষুসংঘ, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী অংশগ্রহণ করে। ফলে দায়ক-দায়িকা এবং ভিক্ষুদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভিক্ষুগণ ধর্মোপদেশ দান করে দায়ক-দায়িকাদের পাপকর্ম হতে বিরত এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করেন। অপরদিকে, দায়ক-দায়িকা ভিক্ষুদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করে ধর্মচর্চা করতে সাহায্য করে। এছাড়া সংঘদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মীয়স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। দানের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নানারকম সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা যায়। বর্তমানে মানুষ ধন-সম্পদের পাশাপাশি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রক্ত দান করছে। ফলে অনেক মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে; দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে। এতে বোঝা যায়, দানানুষ্ঠানের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অনেক।

আলোচনাশেষে সুজন মার্চ মাসের ১৫ তারিখ অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মহিউদ্দিনসহ অন্যান্য ধর্ম অনুসারী আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেন, যেমন– মাইকেল, ধনঞ্জয়, দুর্গা ও ফাতেমা। তাঁরা যথাসময়ে আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁরা অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদান অনুষ্ঠান দেখে খুব খুশি হন। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়; সম্প্রীতি ও সৌহার্দ দৃঢ় হয়। তাঁরাও দান ও সেবামূলক কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত হন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১০

দানানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উপকারিতা সম্পর্কে সাতটি বাক্য লেখো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১১

স্ব-অভিজ্ঞতামূলক প্রতিবেদন লেখার অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও।

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)

-
-
-
-

কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)

-
-
-
-

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

-

-

-

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)

-

-

-

ফিরে দেখা : নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না ঘরে (✔) চিহ্ন দাও :

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		
১১		

এসো করি দান, হই মহীয়ান।।

তৃতীয় অধ্যায়

শীল : অষ্টশীল

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব–

- অষ্টশীল পরিচিতি;
- অষ্টশীল প্রার্থনা ও
- অষ্টশীল পালনের সুফল।

শ্রেণিকক্ষে ঢুকেই শিক্ষক দেখলেন, খুব উৎফুল্ল পরিবেশ। সবাই বেশ হইচই করছে। হাতের ইশারায় তিনি সবাইকে থামিয়ে আনন্দের কারণ জানতে চাইলেন। সুকন্যা দাঁড়িয়ে বলল, আর দুদিন পরেই প্রবারণা পূর্ণিমা। আমরা ঠিক করেছি সবাই মিলে বিহারে যাব এবং শীল গ্রহণ করব।

তা শুনে শিক্ষক বললেন, বাহ্ বেশ তো, আমিও যাব। আচ্ছা, ক্লাস সিক্সে আমরা তো শীল পড়েছিলাম, মনে আছে? সবাই বলে উঠল, হ্যাঁ মনে আছে। তাহলে সবাই মিলে শীল বিষয়ে একটি ধারণা প্রবাহচিত্র তৈরি করো, যেখানে শীলের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, গুরুত্ব প্রভৃতির ধারণা থাকবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১২

শীল সম্পর্কে একটি ধারণা প্রবাহচিত্র তৈরি করো।

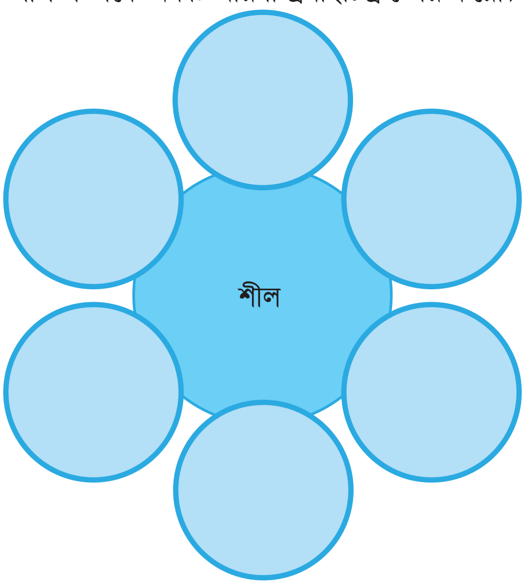

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চার্ট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নানা প্রকার শীল আছে। পঞ্চশীল সম্পর্কে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েছি। এবার আমরা অষ্টশীল সম্পর্কে জানব। এরপর তিনি অষ্টশীল সম্পর্কে বলতে শুরু করেন।

■ অষ্টশীল পরিচিতি

ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন গঠনের জন্য বুদ্ধ উপোসথ প্রবর্তন করেছিলেন। উপোসথ ভিক্ষু এবং গৃহী উভয়ের পালনীয় একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। বৌদ্ধরা পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথিতে উপোসথ পালন করেন। 'উপোসথ' শব্দের সাধারণ অর্থ হলো উপবাস। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম মতে, উপোসথ অর্থ কেবল উপবাস বা খাবার গ্রহণ হতে বিরতি বোঝায় না। উপবাসের সাথে শীল পালন, ধর্মানুশীলন, ধ্যান-সমাধি চর্চা এবং সংযত জীবনযাপন করতে হয়। তাই উপোসথের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। মাঝে মাঝে উপবাসের দ্বারা আহারের উপযোগিতা বোঝা যায়। দরিদ্র অভুক্ত মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া, নৈতিক, মানবিক এবং ধর্মসম্মত পরিশুদ্ধ জীবন গঠন করা যায়। গৃহী বৌদ্ধরা অষ্টশীল গ্রহণের মাধ্যমে উপোসথব্রত পালন করেন। অষ্টশীল গ্রহণ করলে দুপুরের খাবারের পর পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত খাওয়া যায় না। অষ্টশীল গ্রহণকারীরা পঞ্চশীলের সঙ্গে আরও অতিরিক্ত তিনটি শীল পালন করেন।

তবে পঞ্চশীলের তৃতীয় শীল– কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি– এর স্থানে অষ্টশীলে– অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি– বলতে হয়। এর অর্থ সকল প্রকার অব্রহ্মচর্য কর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। এই শীল প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসব্রত পালন করা হয়।

অতিরিক্ত তিনটি শীলের মধ্যে ষষ্ঠ শীল - বিকালে ভোজন থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে ভোজন– করলে তা বিকাল-ভোজন বলে ধরে নেয়া হয়। বিকালে খেলে নানা শারীরিক অসুস্থতা এবং অলসতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সংযম সাধনায় বাধা আসে । তাই খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে সংযত থাকার অভ্যাস করা হয়।

সপ্তম শীলটি নাচ-গান-বাদ্যযন্ত্রের উৎসব দর্শন করা, ফুল-মালা-সুগন্ধি ও অলংকার পরিধান প্রভৃতি হতে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। কারণ এর দ্বারা মন চঞ্চল হয়, মনে লোভ-তৃষ্ণা জাগ্রত হয়। ফলে চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সংযত আচরণে বিঘ্ন ঘটে।

অষ্টম শীল, উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ দামি সুসজ্জিত আরামদায়ক শয্যায় বা বিছানায় শয়ন এবং আসন গ্রহণ করলে আরামপ্রিয়তা ও অলসতা বৃদ্ধি পায়। ভোগের প্রতি আসক্তি জন্মে। এতে আরও লোভ-তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অষ্টশীল গ্রহণের আগে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়। সাধারণত বিহারে ভিক্ষুকে বন্দনা নিবেদন করে অষ্টশীল প্রার্থনা করতে হয়। ভিক্ষু অষ্টশীল প্রার্থনা অনুমোদন করে ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রদান করেন এবং শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাগণ তা গ্রহণ করেন। তবে নিজ বাড়িতেও অষ্টশীল গ্রহণ করা যায়। সেক্ষেত্রে বুদ্ধাসনের সামনে বসে নিজে নিজে অষ্টশীল প্রার্থনাসহ অষ্টশীল গ্রহণ করতে হয়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৩

তোমার অথবা পরিবারের কারও অষ্টশীল পালন করার ঘটনা বা অভিজ্ঞতাটি লেখো

অষ্টশীল প্রার্থনা

অষ্টশীল গ্রহণের আগে ভিক্ষুর কাছে অষ্টশীল প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনাটি এ রকম :

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ অটঠাঙ্গাসমন্নাগতং উপোসথ-সীলং ধম্মং যাচামি, অনুজ্ঞহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ অষ্ঠাঙ্গাসমন্নাগতং উপোসথ-সীলং ধম্মং যাচামি, অনুজ্ঞহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ অষ্ঠাঙ্গাসমন্নাগতং উপোসথ-সীলং ধম্মং যাচামি, অনুজ্ঞহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, একজন প্রার্থনা করলে ‘অহং’ ও ‘যাচামি’ এবং বহুজনে করলে ‘ময়ং’ ও ‘যাচাম’ হবে।

অষ্টশীল প্রার্থনার বাংলা অনুবাদ

ভন্তে অবকাশপূর্বক (ভন্তে আপনার অবসর হলে) সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে দয়া করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভন্তে অবকাশপূর্বক (ভন্তে আপনার অবসর হলে) সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে দয়া করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভন্তে অবকাশপূর্বক (ভন্তে আপনার অবসর হলে) সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে দয়া করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভিক্ষু : যমহং বদামি তং বদেথ (আমি যা বলছি তা বলুন)।
শীল গ্রহণকারী : আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে বলছি)
ভিক্ষু : নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স (তিনবার বলতে হবে)।
এরপর ভিক্ষু ত্রিশরণ গ্রহণ করতে বলবেন।

ত্রিশরণ প্রার্থনা : পালি ও বাংলা

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি (আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি)।

ধম্মং সরণং গচ্ছামি (আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি)।

সংঘং সরণং গচ্ছামি (আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি)।

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি (আমি দ্বিতীয়বার বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি)।

দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি (আমি দ্বিতীয়বার ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি)।

দুতিযম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি (আমি দ্বিতীয়বার সংঘের শরণ গ্রহণ করছি)।

ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি (আমি তৃতীয়বার বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি)।

ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি (আমি তৃতীয়বার ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি)।

ততিযম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি (আমি তৃতীয়বার সংঘের শরণ গ্রহণ করছি)।

ভিক্ষু : সরণা গমনং সম্পন্নং (শরণে গমন বা শরণ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে)।
শীল প্রার্থনাকারী : আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে)।
এরপর ভিক্ষু অষ্টশীল প্রদান করবেন এবং শীল গ্রহণকারী তা মুখে মুখে বলবেন।

অষ্টশীল (পালি)

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

বিকাল-ভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

নচ্চ-গীত-বাদিত বিসূক দস্সন-মালাগন্ধ-বিলেপন-ধারণ- মন্ডন-বিভূসনটঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

উচ্চসযন-মহাসযনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অষ্টশীল (বাংলা)

আমি প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি সুরা এবং মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি বিকালে ভোজন থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি নাচ-গান-বাদ্য উৎসব দর্শন, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ মন্ডন বিভূষণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা (অত্যন্ত আরামদায়ক শয্যা) থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৪

অষ্টশীল গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সবাই মিলে ভূমিকাভিনয় করো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৫

অষ্টশীল গ্রহণ করার পরে তোমার অভিজ্ঞতাটি নিচে শিখন প্রতিফলনে লেখো।

শিখন প্রতিফলন

১. অষ্টশীল গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে লেখো।

২. অষ্টশীল গ্রহণের অভিজ্ঞতার অনুভূতি লেখো।

৩. অষ্টশীল পালনের ফলে তুমি কী সুফল পেয়েছ তা লেখো।

অষ্টশীল সম্পর্কে বলার পর শিক্ষক অষ্টশীল পালনের সুফল সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অষ্টশীল পালনের সুফল

অষ্টশীল পালনের সুফল অনেক। অবিদ্যার কারণে মানুষের মধ্যে তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষার কারণেই লোভের জন্ম হয়। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ নানারকম অসৎ কর্মে জড়িয়ে পড়ে। ফলে নানারকম দুঃখ ভোগ করে। অষ্টশীল পালনের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সংযম, সততা, শৃঙ্খলা, নম্রতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য প্রভৃতি গুণাবলির বিকাশ ঘটে। লোভ-তৃষ্ণা দূরীভূত হয়। আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। নীরোগ ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। ধর্ম চেতনা জাগ্রত হয় এবং ধর্মসম্মত জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। এছাড়া, নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠন করা যায়। পারিবারিকভাবে অষ্টশীল পালনের অভ্যাস গড়ে তুললে পারিবারিক জীবনও সুখের হয়। তাই সকলের অষ্টশীল গ্রহণ করা উচিত।

এরপর, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অষ্টশীল পালনের উপদেশ দিয়ে পাঠ শেষ করেন।

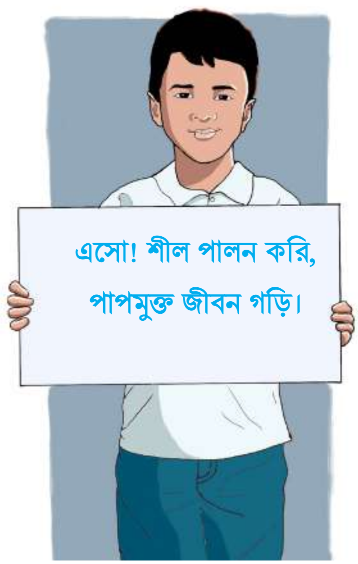

চতুর্থ অধ্যায়

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব–

- আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ;
- আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের পরিচয়;
- আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের উপকারিতা।

একদিন বিকেলে ধর্মকথা শোনার জন্য পাঁচ বন্ধু বিহারে যায়। তারা বিহারে গিয়ে প্রথমে প্রদীপ ও ধূপবাতি জ্বালিয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ বন্দনা করে। এরপর তারা বিহারের ভিক্ষুকে বন্দনা নিবেদন করে ধর্মকথা শোনানোর জন্য অনুরোধ করেন। ভিক্ষু আনন্দমনে তাদের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং তাদের নানা রকম ধর্মকথা শোনাতে থাকেন। কিন্তু তিনি লক্ষ করলেন চার বন্ধু মনোযোগ দিয়ে ধর্মকথা শুনলেও একজন অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে ভিক্ষু জানতে পারলেন, তার পিতা খুবই অসুস্থ। তাই তার মন ভালো নেই। তখন ভিক্ষু বললেন : মানুষ জীবনে নানারকম দুঃখ ভোগ করে। অসুখ হলে দুঃখ পায়। বৃদ্ধ হলে দুঃখ পায়। প্রিয় বিচ্ছেদ হলে দুঃখ পায়। কটু কথা শুনলে দুঃখ পায়। শারীরিক আঘাত পেলে দুঃখ পায়। তবে দুঃখ হতে মুক্তির

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

উপায়ও আছে। যেমন– একদিন রূপেন বাবুর খুব জ্বর হয়েছিল। কিছুতেই জ্বর সারছিল না। জ্বরের কারণে তিনি খেতে পারছিলেন না। ঘুমাতে পারছিলেন না। বমি করছিলেন এবং শরীরে ব্যথা অনুভব করছিলেন। তিনি অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন। পরিবারের লোকজন তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ডাক্তার জানতে পারলেন যে, রূপেন বাবু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। রোগের কারণ জেনে ডাক্তার তাকে ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ খেতে দিলেন। ডাক্তারের পরামর্শমতো রূপেন বাবু নিয়মিত ওষুধ খেলেন। কিছুদিন পর তাঁর জ্বর সেরে গেল এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। আবার আগের মতো রূপেন বাবু কাজ করতে লাগলেন। এ ঘটনা হতে বোঝা যায় যে, শারীরিক দুঃখের কারণ এবং মুক্তির উপায় জানলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। বুদ্ধ বলেছেন, মানব জীবনে দুঃখ আছে। দুঃখের কারণ আছে এবং দুঃখ মুক্তির উপায়ও আছে। তিনি আরও বলেছেন, মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখ হতে মুক্ত থাকতে পারে। দুঃখ মুক্তির উপায় হিসেবে বুদ্ধ আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশনা করেছেন এবং দুঃখমুক্ত থাকার জন্য তিনি মানুষকে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন। আজ আমি তোমাদের আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে বলব। প্রথমে তিনি আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের অর্থ এবং আটটি মার্গ কী কী তা বললেন। এরপর তিনি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের পরিচয়। শেষে তিনি আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের উপকারিতা বর্ণনা করেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৬

তোমার দেখা একজন অসুস্থ ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে নিচে লেখো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৭

তুমি মানুষকে কী কী ধরনের দুঃখ পেতে দেখেছ, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৮

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী, তা দলে আলোচনা করো।

তথাগত বুদ্ধ

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ :

'আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের' 'আর্য' শব্দের অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ, উত্তম, পরিশুদ্ধ। অষ্টাঙ্গিক হলো আটটি অঙ্গ। আর 'মার্গ' শব্দের অর্থ হলো পথ বা উপায়। অতএব, আটটি অঙ্গ নিয়ে উত্তম (শ্রেষ্ঠ) পথ (উপায়) হলো আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ মধ্যম পথ নামেও পরিচিত। এই আটটি পথ হলো :

১. সম্যক দৃষ্টি	৫. সম্যক জীবিকা
২. সম্যক সংকল্প	৬. সম্যক স্মৃতি
৩. সম্যক বাক্য	৭. সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা এবং
৪. সম্যক কর্ম	৮. সম্যক সমাধি।

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের পরিচিতি

১. সম্যক দৃষ্টি : 'সম্যক' শব্দের অর্থ হলো সঠিক, সত্য বা অভ্রান্ত। আর 'দৃষ্টি' শব্দের অর্থ দেখা, বোঝা, ধারণা করা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি। অতএব, সম্যক দৃষ্টির অর্থ হলো কোনো কিছু সঠিকভাবে দেখা, বোঝা বা উপলব্ধি করা। জীবন ও জগৎকে সঠিকভাবে দেখা বা বোঝাই হলো সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টির অভাবের কারণে মানুষ জীবন ও জগতের প্রকৃত স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে না। জীবন ও জগতের সঠিক স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য জানি না বলেই আমরা দুঃখ পাই। যেমন– একটি প্রিয় খেলনা ভেঙে গেলে আমরা দুঃখ পাই। প্রিয়জন কিংবা একটি প্রিয় পোষা প্রাণী মারা গেলে আমরা দুঃখ পাই। কিন্তু সকল বস্তুই একদিন না একদিন ধ্বংস হয়। সকল মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদের–একদিন মৃত্যু হয়। এটিই বস্তু এবং প্রাণীর প্রকৃত স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য। আমরা বস্তু এবং জীবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না বলেই শোক-দুঃখে জর্জরিত হয়ে পড়ি। জগতের বৈশিষ্ট্য হলো দুঃখময়তা। জীবনে সকল মানুষ বা

প্রাণী কোনো না কোনো দুঃখ ভোগ করে। তবে সেই দুঃখের কারণ আছে, সেই দুঃখ নিরোধ করা যায় এবং সেই দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে।

এই চার আর্যসত্যকে জানা বা উপলব্ধি করাই হলো সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টির অভাবে মানুষ লোভ-তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে এবং কুশল-অকুশল কর্ম চিনতে পারে না। লোভ-তৃষ্ণার কারণেই মানুষ নানারকম অকুশল কর্মে জড়িত হয়। ফলে নানারকম দুঃখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তিনি সর্বদা অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকেন এবং কুশল কর্ম সম্পাদন করেন। এছাড়া, তিনি জীবন ও জগতের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। ফলে তিনি দুঃখমুক্ত থাকতে পারেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৯

সম্যক দৃষ্টি বলতে তুমি কী বোঝ, তা নিজের ভাষায় লেখো।

২. সম্যক সংকল্প : ‘সংকল্প’ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিজ্ঞা, পণ, শপথ ইত্যাদি। সুতরাং সম্যক সংকল্পের অর্থ হলো সঠিক বা উত্তম প্রতিজ্ঞা বা উত্তম শপথ। মানুষ নানা রকম সংকল্প করে। কেউ ডাক্তার-নার্স হয়ে মানুষের সেবা করার সংকল্প করে। কেউ প্রকৌশলী হয়ে মানুষের ব্যবহারের জন্য নানা কিছু উদ্ভাবনের সংকল্প করে। কেউ কৃষক হয়ে শস্য উৎপাদনের সংকল্প করে। আবার কেউ ধর্মপ্রচারক হয়ে মানুষকে ধার্মিক বানানোর সংকল্প করে। বৌদ্ধদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ লাভ করা। তাই সকল বৌদ্ধ বিভিন্ন কাজ করার পাশাপাশি নির্বাণ লাভের সংকল্প করে। নির্বাণ লাভ হলে সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়। নির্বাণ লাভের জন্য প্রত্যেক মানুষকে লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং তৃষ্ণা ক্ষয় করতে হয়। দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়। দশ পারমী সম্পর্কে আমরা উচ্চ শ্রেণিতে পড়ব। এছাড়া অকুশল কর্ম বর্জন ও কুশল কর্ম চর্চা করতে হয়। মৈত্রী ও করুণাপরায়ণ হতে হয়।

অপরের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে হয় এবং সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করতে হয়। অতএব, নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য এবং নির্বাণ লাভের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াকে সম্যক সংকল্প বলে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২০

তুমি কি কোনো কিছু করার সংকল্প করেছ? তোমার সংকল্প সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

৩. সম্যক বাক্য : সঠিক, যথার্থ, গ্রহণযোগ্য এবং উপযুক্ত বাক্যই হচ্ছে সম্যক বাক্য। মিথ্যা, কর্কশ, অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় বৃথা বাক্য বলা উচিত নয়। এসব বাক্য মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে, মানুষকে দুঃখ দেয়। তাই এরকম বাক্য বলা থেকে বিরত থেকে সঠিক, উপযুক্ত, অর্থপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য, সুভাষিত এবং সত্য বাক্য বলা উচিত। সম্যক বাক্য দিয়ে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়, মানুষ সুখী এবং খুশি হয়। বুদ্ধ সম্যক বাক্য বলার উপদেশ দিয়েছেন।

৪. সম্যক কর্ম : সঠিক এবং কুশল কর্মকে বলে সম্যক কর্ম। দান করা, সেবা করা, পরের উপকার করা, বৃক্ষ রোপণ করা, ধর্মকথা শোনা, ধ্যান-সমাধি চর্চা করা, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা, পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা প্রভৃতি সম্যক কর্ম। সম্যক কর্ম সর্বদা নিজের এবং অপরের কল্যাণ সাধন করে। অপরদিকে, চুরি, হত্যা, আঘাত, নেশাদ্রব্য গ্রহণ, পরিবেশ দূষণ করা, প্রভৃতি অকুশল কর্ম। অকুশল কর্ম নিজের এবং অপরের ক্ষতিসাধন করে। মানুষকে দুঃখ দেয়। সকল প্রকার অকুশল কর্ম থেকে বিরত থেকে কুশল কর্ম করাই হচ্ছে সম্যক কর্ম।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২১

সম্যক কর্ম ও মন্দ কর্মের একটি তালিকা তৈরি করো।

সম্যক কর্মের তালিকা	মন্দ কর্মের তালিকা
১	১
২	২
৩	৩
৪	৪
৫	৫

৫. সম্যক জীবিকা : যে কাজ করে মানুষ জীবন ধারণ করে তাকে জীবিকা বলে। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে, নৈতিক, মানবিক এবং মঙ্গলময় কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করাকে বলে সম্যক জীবিকা। মানুষ এবং প্রাণিকুলের জন্য উপকারী জীবিকা উত্তম জীবিকা। এরকম জীবিকা গ্রহণ করা উচিত। যে কাজ মানুষ এবং প্রাণিকুলের ক্ষতি সাধন করে তা হীন জীবিকা। হীন জীবিকা গ্রহণ করা উচিত নয়। বুদ্ধ মানুষ এবং প্রাণিকুলের জন্য ক্ষতিকারক পাঁচ প্রকার বাণিজ্য পরিহার করতে বলেছেন। এই পাঁচ প্রকার বাণিজ্য হলো : অস্ত্র, বিষ, প্রাণী, মাংস এবং নেশাদ্রব্য বাণিজ্য। এই বাণিজ্যগুলো মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি নষ্ট করে। সম্পর্ক ও সম্প্রীতি নষ্ট করে। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। বুদ্ধ সর্বদা সৎ বাণিজ্য এবং কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহের উপদেশ দিয়েছেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২২

কয়েকটি সৎ ও মন্দ জীবিকার নাম লেখো। তুমি কোন ধরনের জীবিকা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং কেন তা নিচে লেখো।

৬. সম্যক স্মৃতি : 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ স্মরণ, পুনরায় জানা, মনের সজাগ অবস্থা, ধারণাশক্তি, মনের সচেতনতা, স্মরণ রাখার ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। সুতরাং সম্যক স্মৃতি হলো সৎ বা কুশল কর্ম ভালোভাবে বা বারবার স্মরণ করা বা পর্যবেক্ষণ করা। মানুষ অনেক কুশল কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু স্মরণ না করার কারণে সেগুলো মনে থাকে না। আবার অনেক অকুশল কর্মের কথা বারবার মনে ভেসে উঠে। কুশল কর্মের স্মৃতি মনে পড়লে আরও কুশল কর্ম করার ইচ্ছা জাগে। তেমনি, অকুশল কর্মের স্মৃতি মনে পড়লে আরও অকুশল কর্ম করার ইচ্ছা জাগতে পারে। কুশল কর্মকে বারবার স্মরণ করা এবং অকুশল কর্ম স্মরণে না আসার চেষ্টাকে বলে সম্যক স্মৃতি। স্মৃতিহীন মানুষ মাঝিবিহীন নৌকার মতো। মাঝি ছাড়া নৌকা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। যেখানে সেখানে বিপদে পড়ে। তেমনি সম্যক স্মৃতিহীন মানুষ সফলতা পায় না। অকুশল কর্মে জড়িত হয়ে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং নির্বাণ লাভে ব্যর্থ হয়। সম্যক স্মৃতি শুভ চিন্তাকে জাগিয়ে রাখে, অশুভ চিন্তাকে বাধা দেয়। তাই আমাদের সম্যক স্মৃতি অনুশীলন করা উচিত।

এই চার প্রকার প্রচেষ্টা মানুষকে পাপকাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং পাপকাজ বিনাশে সহায়তা করে। অপরদিকে, যে পুণ্যকর্ম করা হয়নি তা করার জন্য এবং অর্জিত পুণ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

৭. সম্যক ব্যায়াম : 'ব্যায়াম' শব্দের অর্থ হলো প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, উদ্যম ইত্যাদি। সুতরাং সম্যক ব্যায়াম হলো সৎ বা উত্তম প্রচেষ্টা। উদ্যম বা প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষ কোনো কাজেই সফলতা লাভ করতে পারে না। মানুষের মন চঞ্চল, অস্থির; ভালো এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজে মন আকৃষ্ট হয়। মনকে সংযত রেখে এবং সুপথে পরিচালিত করে কল্যাণকর কাজ করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় সম্যক ব্যায়াম। বুদ্ধ মানুষকে চার প্রকার প্রচেষ্টা বা সম্যক ব্যায়াম অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলো হলো :

১) উৎপন্ন পাপ বা অসৎ কর্ম বিনাশের প্রচেষ্টা;

২) অনুৎপন্ন পাপ বা অসৎ কর্ম উৎপন্ন না করার প্রচেষ্টা;

৩) অনুৎপন্ন পুণ্য বা সৎকর্ম উৎপন্নের প্রচেষ্টা এবং

৪) উৎপন্ন পুণ্য বা সৎকর্ম রক্ষা ও বৃদ্ধির প্রচেষ্টা।

৮. সম্যক সমাধি : 'সমাধি' শব্দের অর্থ হলো একাগ্রতা, ধ্যান, মনের একাগ্র অবস্থা ইত্যাদি। ভালোভাবে মনের বা চিত্তের একাগ্রতা সাধন হলো সম্যক সমাধি। মন চঞ্চল ও সর্বদা অস্থির থাকে। লাভ-অলাভ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, যশ-অযশ প্রভৃতি বিচার না করে মন সব জায়গায় যেতে চায়। মন মানুষকে পরিচালিত করে। যারা মনকে সংযত করতে পারে না তারা নানারকম খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে নানা রকম দুঃখ ভোগ করে। মনের একাগ্রতা সাধন করতে না পারলে বা মনোযোগ সহকারে না করলে কোনো কাজেই সফলতা পাওয়া যায় না। বুদ্ধ সমাধি চর্চার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাহিত চিত্ত ছাড়া নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। তাই সকলের সমাধি চর্চা করা উচিত।

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের উপকারিতা

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের উপকারিতা অনেক। প্রথম মার্গ 'সম্যক দৃষ্টি' অনুশীলনকারী ব্যক্তির মধ্যে সঠিক জ্ঞানের উপলব্ধি হয় এবং ভুল ধারণা দূর হয়। ফলে তার মধ্যে লোভ-দ্বেষ-মোহ উৎপন্ন হতে পারে না। তিনি জীব-জগতের স্বরূপ, কুশল-অকুশল এবং সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি বুঝতে পারেন। তিনি জানতে পারেন, জগতে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তা বিনাশধর্মী। দ্বিতীয় মার্গ 'সম্যক সংকল্প' অনুশীলনকারী ব্যক্তি খারাপ কাজ এবং লোভ-দ্বেষ-মোহ ত্যাগ, সৎ কর্ম সম্পাদন এবং নির্বাণ লাভের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তৃতীয় মার্গ 'সম্যক বাক্য' অনুশীলনকারী ব্যক্তি কর্কশ, মিথ্যা, বৃথা বাক্য প্রভৃতি বলা এবং পরনিন্দা থেকে বিরত থেকে সুভাষিত ও অর্থপূর্ণ বাক্য বলতে উদ্বুদ্ধ হন। চতুর্থ মার্গ 'সম্যক কর্ম' অনুশীলনকারী ব্যক্তি অকুশল কর্ম পরিত্যাগ করে কুশল কর্ম সম্পাদনে অনুপ্রাণিত হন। পঞ্চম মার্গ 'সম্যক জীবিকা' অনুশীলনকারী ব্যক্তি খারাপ বা হীন জীবিকা ত্যাগ করে সৎ জীবিকার মাধ্যমে জীবন নির্বাহে সচেষ্ট হন। ষষ্ঠ মার্গ 'সম্যক ব্যায়াম' চর্চাকারী ব্যক্তি অসৎ কর্ম বিনাশ ও উৎপন্ন না হওয়ার জন্য এবং সৎ কর্ম উৎপন্ন ও বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। সপ্তম মার্গ 'সম্যক স্মৃতি' অনুশীলনকারী ব্যক্তি সর্বদা কুশল স্মৃতি জাগ্রত রাখেন। ফলে তাঁর মনে অকুশল চিন্তাভাবনা উদয় হতে পারে না। অষ্টম মার্গ 'সম্যক সমাধি' অনুশীলনকারী ব্যক্তির চিত্ত বা মন সর্বদা সংযত ও সমাহিত থাকে। ফলে তিনি যে কোনো কাজ সঠিকভাবে করতে পারেন।

নির্বাণ লাভের জন্য শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা শীলের অন্তর্গত, যা নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনে সহায়তা করে। সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি–সমাধির অন্তর্গত; যা চিত্ত বা মনের উৎকর্ষ ও একাগ্রতা সাধন করে। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্গত, যার অনুশীলনে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। এতে বোঝা যায়, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। নির্বাণ লাভ হলে সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত থাকা যায়। বুদ্ধ বলেছেন, নিব্বাণং পরমং সুখং। অর্থাৎ নির্বাণ পরম সুখ। অতএব, পরম সুখকর নির্বাণ লাভের জন্য সকলের আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে জেনে পাঁচ বন্ধু বুঝতে পারল, জগৎ দুঃখময়। জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিরোধ করা সম্ভব এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে দুঃখ নিরোধের উপায়। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করলে দুঃখ হতে মুক্ত থাকা যায়। এজন্য, তারা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করে নির্বাণ লাভের প্রতিজ্ঞা করেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৩

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের কোন কোন মার্গ তুমি অনুশীলন কর এবং তোমার জীবনে এর ফলাফল সম্পর্কে একটি ৫০০ শব্দের অভিজ্ঞতা প্রতিবেদন (Experiential Learning Report) লেখো। অনুগ্রহ করে ক্লাস শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৪

অভিজ্ঞতা প্রতিবেদন (Experiential Learning Report) তৈরি করতে তোমার কেমন লেগেছে, সে সম্পর্কে লিখিত মতামত দাও।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম : অভিজ্ঞতা প্রতিবেদন লেখা

শিখন প্রতিফলন

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)

কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

ফিরে দেখা : নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না ঘরে (✔) চিহ্ন দাও :

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
১২		
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		
১৭		
১৮		
১৯		
২০		
২১		
২২		
২৩		
২৪		

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ করলে অনুসরণ, পাব দুঃখমুক্ত সুখী জীবন।।

পঞ্চম অধ্যায়

চরিতমালা

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব–

- সারিপুত্র থেরর জীবন-দর্শন;
- কৃশা গৌতমী থেরীর জীবন-দর্শন।

শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু দীর্ঘদিন ভিক্ষুজীবন পালন করছেন। তিনি জ্ঞানে-গুণে অনন্য। সর্বদা ধর্মীয় কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। সারাদেশে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। এক মধু পূর্ণিমায় অজন্তা বিহারে তাঁকে ধর্মদেশনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার পর, যথাসময়ে শুরু হয় আলোচনা সভা। যথাযথ সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি দেশনা শুরু করেন। তিনি বলেন, এই পৃথিবীতে বহু জ্ঞানী, গুণী ও মহৎ ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, যাঁরা মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। অনেক মহৎ কর্ম করেছেন। তাঁদের কাজে জীবজগৎ নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। কর্মগুণে তাঁরা পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। মানুষ আজও তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকে এরকম অনেক জ্ঞানী-গুণী, থের-থেরী, উপাসক-উপাসিকা, শ্রেষ্ঠী এবং রাজন্যবর্গের কথা আছে, যাঁরা কর্মগুণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। সৎ ও আদর্শ জীবন গঠন করতে হলে এরকম মনীষীর জীবনী পাঠ এবং গুণাবলি অনুসরণ করা উচিত। আজ আমি কয়েকজন বৌদ্ধ মনীষীর কথা বলব, যাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমরা সহজে সুন্দর ও মহৎ জীবন গঠন করতে পারি। আমি প্রথমে সারিপুত্র থের সম্পর্কে বলব।

সারিপুত্র থের

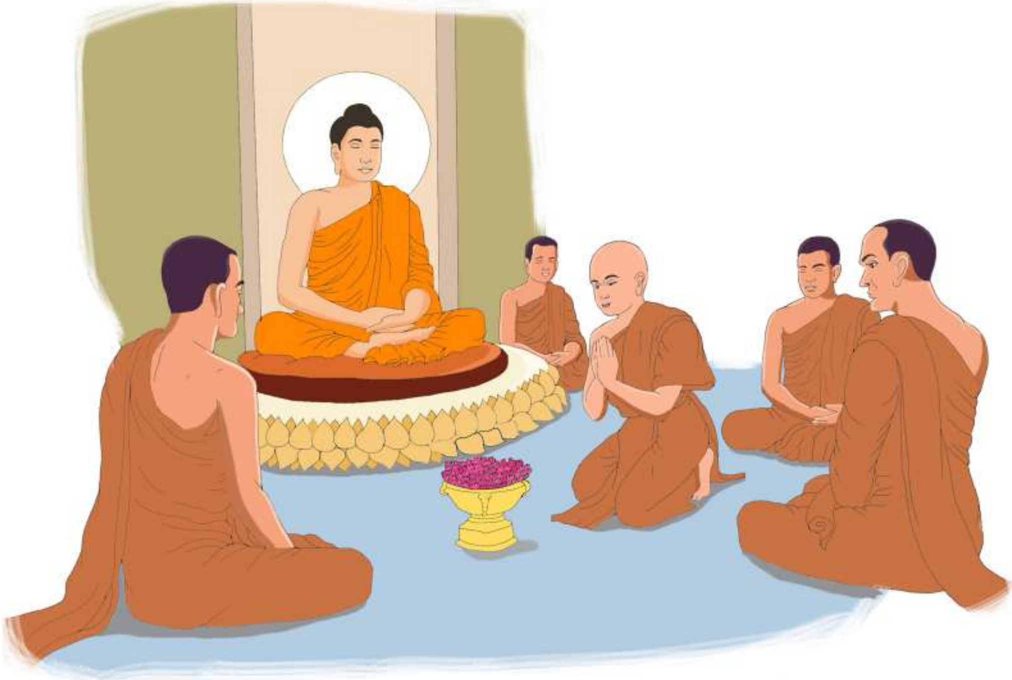

বুদ্ধের সামনে সারিপুত্র থের ও অন্যান্য শিষ্য

সারিপুত্রের গৃহীনাম ছিল উপতিষ্য। তাঁর মায়ের নাম ছিল সারি ব্রাহ্মণী, পিতার নাম জানা যায়নি। সারি ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে তাঁকে সারিপুত্র নামে ডাকা হতো। তিনি উপতিষ্য গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সারিপুত্রের তিন ভাই ও তিন বোন ছিলেন। ভাইদের নাম ছিল চুন্দ, উপসেন ও রেবত। বোনদের নাম ছিল চালা, উপচালা এবং শিশুপচালা। তিনি নিজে এবং তাঁর সকল ভাই-বোন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। সারিপুত্র ছিলেন অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন।

একদিন সারিপুত্র তার বন্ধু মৌদ্গালায়নের সঙ্গে একটি নাটক দেখতে যান। নাটক দেখে তাঁদের মনে বৈরাগ্যভাব জাগে। তাঁরা সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর সারিপুত্র ও মৌদ্গালায়ন গৃহত্যাগ করে ব্রাহ্মণ সঞ্জয় বেলট্ঠীপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ও তাঁর বন্ধু গুরুর জানা সকল বিদ্যা শিখে নেন। কিন্তু গুরুর কাছে পরম মুক্তির পথের সন্ধান না পেয়ে দুই বন্ধু গুরুকে ত্যাগ করে চলে যান। উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে তাঁরা দুজন যান দুদিকে। কথা ছিল সেরকম গুরুর সন্ধান পেলে তাঁরা আবার একত্র হবেন এবং একে অপরকে জানাবেন। এর কিছুদিন পর সারিপুত্র রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সেখানে সারিপুত্র বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিতকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে দেখেন। অশ্বজিতের সৌম্য চেহারা দেখে সারিপুত্র মুগ্ধ হন। তিনি অশ্বজিতের সঙ্গে আলাপ করেন। একপর্যায়ে সারিপুত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন,

***আপনি কার শিষ্য?**

***আপনার গুরু কে?**

***তিনি কোন মতবাদী?**

অশ্বজিত বললেন, শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণ গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ আমার শাস্তা (শিক্ষক)। সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্মমত জানার জন্য সারিপুত্রের কৌতূহল হলো। ভিক্ষু অশ্বজিত তাঁকে বুদ্ধভাষিত একটি গাথা শোনালেন। গাথাটির মর্মকথা হলো:

'পৃথিবীর সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ আছে। কারণ ছাড়া কোনো কিছুই উৎপন্ন হয় না।' বুদ্ধ আরও বলেছেন, 'জগতে দুঃখ আছে। দুঃখেরও কারণ আছে। দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। পরম নির্বাণ লাভের মাধ্যমেই এই দুঃখের অবসান হয় এবং পরম শান্তি অর্জিত হয়।

এটিই বুদ্ধের মতবাদ। অতএব, বুদ্ধ নির্বাণবাদী।

গাথাটি শোনার পরে তিনি স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। এরপর সারিপুত্র গিয়ে মৌদ্‌গালায়নকে বিষয়টি জানান। সারিপুত্র থেকে গাথাটি শুনে মৌদ্‌গালায়নও স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। পরিশেষে তাঁরা বুদ্ধের কাছে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। দুই বন্ধু রাজগৃহে উপস্থিত হন। এ সময় বুদ্ধ রাজগৃহে শিষ্যদের ধর্মদেশনা করছিলেন। বুদ্ধ দূর থেকে দিব্যজ্ঞানে তাঁদের মনোভাব জানতে পেরে উভয়কে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত করলেন। দীক্ষার পর তিনি সারিপুত্র থের নামে পরিচিতি পান। দীক্ষিত হওয়ার পনের দিনেই সারিপুত্র থের অর্হত্ব ফল লাভ করেন। দীক্ষার দিন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সঙ্ঘের সমাবেশে বুদ্ধ সারিপুত্রকে অগ্রশ্রাবক হিসেবে ঘোষণা করে পাতিমোক্ষ দেশনা করেন। এই পদের জন্য তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ছিল। 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ হলো শিষ্য। অতএব অগ্রশ্রাবক হলো শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এতে বোঝা যায়, সারিপুত্র থের ছিলেন বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে গুণে ও মানে অগ্রবর্তী।

সারিপুত্র ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনে ছিলেন সুপণ্ডিত। বুদ্ধের ভাষণগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। জেতবন বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধ সারিপুত্র থেরকে মহাপ্রজ্ঞাবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন এবং 'ধর্মসেনাপতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ধর্মদেশনার সময় সারিপুত্র সব সময় বুদ্ধের ডান দিকের আসনে বসতেন। এজন্য তাঁকে বুদ্ধের 'ডান হস্ত' হিসেবেও বলা হতো।

বুদ্ধের আগেই সারিপুত্র থের পরিনির্বাণ লাভ তথা মৃত্যুবরণ করেন। সারিপুত্র থের অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে তিনি নিজমৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই পরিনির্বাণের আগে তিনি বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে নিজ জন্মস্থানে পরিনির্বাণের অনুমতি নেন। এরপর তিনি জন্মস্থানে ফিরে যান এবং নির্বাণপ্রাপ্ত হন। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তথাগত বুদ্ধের অনুমতি গ্রহণ করে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সারিপুত্রের দেহভস্মের ওপর শ্রাবস্তীতে একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

সারিপুত্রের উপদেশ

মানুষ মরণশীল। যে কোনো সময় মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাই শীলাদি ধর্ম পরিপূর্ণ করো। যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করো। দুঃখে পড়ে বিনাশ হয়ো না। শত্রুর ভয়ে নগরের ভিতর-বাহির যেমন সুরক্ষিত করা হয়, তেমনি নিজেকে সুরক্ষিত করে সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত রাখো। যারা শীলাদি পালন করে না, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করে না, তারা নরকে পতিত হয়ে শোক করে।

সারিপুত্র থেরর জীবনচরিত বর্ণনা করার পর ভিক্ষু পুনরায় বললেন :

সারিপুত্র থেরর জীবনচরিত থেকে যে শিক্ষা পাই, তা হলো– একাগ্রতা ও অধ্যবসায় থাকলে অবশ্যই মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। মানুষের জীবনে কোনো কাজ বৃথা যায় না। মানুষ ভালো কাজের ভালো ফল, খারাপ কাজের মন্দ ফল ভোগ করে। গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে খারাপ কাজ করা উচিত নয়। সকল প্রকার পাপকাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৫

সারিপুত্র থেরর উপদেশ হতে তুমি কী শিক্ষা লাভ করেছ, তা লেখো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৬

সারিপুত্র থেরর কোন গুণটি তুমি অর্জন করতে চাও লেখো।

সারিপুত্র থেরর জীবনাদর্শ বর্ণনা করার পর শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু বললেন, আমরা জীবজগতের প্রকৃত রূপ বুঝি না বলে নানাভাবে কষ্ট পাই, শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সহজে আমাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান, জীবজগতের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারে, তাঁরা সহজে কষ্ট পান না। শোকগ্রস্ত হন না। তাঁরা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে মহৎ জীবন গঠন করে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এরকম একজন থেরী আছেন যিনি একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে পাগলপ্রায় হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধের উপদেশ শুনে জীবনের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারেন এবং ভিক্ষুণী হয়ে নিজ কর্মগুণে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তাঁর নাম কৃশা গৌতমী : আমি তাঁর জীবন কাহিনিটি বলছি।

কৃশা গৌতমী বুদ্ধের কাছে ওষুধ চাইছেন

কৃশা গৌতমী থেরী

গৌতম বুদ্ধের সময়ে কৃশা গৌতমী শ্রাবস্তী নগরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার শরীর কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা গৌতমী নামে পরিচিত ছিলেন। বিবাহিত জীবনে তিনি তেমন আদর-যত্ন পাননি। লোকে তাঁকে অনাথা বলত। কিন্তু পুত্রসন্তান প্রসবের পর তাঁকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি অতি আদরে ছেলেকে বড়ো করছিলেন। ছেলেটা যখন হাঁটতে শুরু করল তখন হঠাৎ মারা যায়। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে মা কৃশা গৌতমী শোকে পাগলের মতো হয়ে গেল। সন্তানের জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য সবার কাছে বলতে লাগলেন, 'আমার সন্তানের জন্য ওষুধ দাও।' লোকজন পুত্রশোকে কাতর মায়ের মনোবেদনা না বুঝে ব্যঙ্গ করতে লাগল। অবশেষে এক ভদ্রলোক তাঁকে বুদ্ধের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ভদ্রলোকের কথামতো তিনি বুদ্ধের কাছে যান এবং বলেন : 'ভগবান! আমার সন্তানের জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য ওষুধ দিন।' বুদ্ধ কৃশা গৌতমীর উচ্চতর জীবনের যোগ্যতা বুঝতে পেরে এবং জীবনের বাস্তব পরিণতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বললেন, 'নগরে যাও। সেখানে গিয়ে যে ঘরে কখনো কারো মৃত্যু হয়নি, সেরকম একটি ঘর থেকে এক মুঠো সরিষা বীজ নিয়ে এসো।' বুদ্ধের কথা শুনে কৃশা গৌতমী শান্ত হলেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে সরিষা বীজ ভিক্ষা করতে লাগলেন, বীজ পেয়ে তিনি যখন জিজ্ঞেসা করলেন, 'এই ঘরে কোনো মৃত্যু হয়েছে কি না? সবাই উত্তরে বলল, 'এখানে কত মৃত্যু হয়েছে, তার হিসেব নেই।' এভাবে ঘুরে তিনি বুঝতে পারলেন, কোনো ঘরই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি। কেউ মৃত্যুর ঊর্ধ্বে নয়। জীবনের করুণ পরিণতি বুঝতে পেরে কৃশা গৌতমী মৃত পুত্রকে শ্মশানে নিয়ে গেলেন এবং পুত্রের মৃতদেহ রেখে বললেন,

মৃত্যু কোনো পল্লিবিশেষের ধর্ম নয়, নগরবিশেষের নয়, কোনো বংশবিশেষেরও নয়; স্বর্গ, মর্ত্য সর্বজগতের জন্য এই ধর্ম। সকল বস্তু অনিত্য।

এ কথা বলে তিনি বুদ্ধের কাছে গেলেন। বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গৌতমী সরিষা বীজ পেয়েছ কি?' কৃশা গৌতমী উত্তরে বললেন, 'ভগবান সরিষা বীজের আর প্রয়োজন নেই। আমাকে দীক্ষা দান করুন।' তখন বুদ্ধ তাঁকে বললেন, 'বন্যার স্রোতে যেমন গ্রাম, নগর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি ভোগবিলাসে রত মানুষও মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়।'

বুদ্ধের উপদেশ শুনে কৃশা গৌতমী স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন এবং ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা দানের জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হয়। ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি সাধনার বলে প্রজ্ঞা লাভ করেন এবং লোভ, তৃষ্ণা, হিংসা প্রভৃতি ক্ষয় করে অর্হত্ব লাভ করেন। তিনি ভিক্ষুণীসংঘের নিয়মকানুন ভালোভাবে পালন করতেন। বুদ্ধ তাঁকে অমসৃণ বস্ত্র পরিধানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। তিনি অনেক গাথা ভাষণ করেছিলেন। তাঁর কিছু উপদেশ নিচে তুলে ধরা হলো :

১. সাধু ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে জ্ঞানী হওয়া যায়। সাধু ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা জ্ঞানীগণ প্রশংসা করেন।
২. সৎ মানুষকে অনুসরণ করলে জ্ঞান বর্ধিত হয়।
৩. চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করো।
৪. আমি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, নির্বাণ উপলব্ধি করেছি। আমি বেদনামুক্ত, ভারমুক্ত। আমার চিত্ত সম্পূর্ণ তৃষ্ণামুক্ত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৭

"বুদ্ধের উপদেশ কৃশা গৌতমীর অর্হত্ব লাভের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল"– উক্তিটি সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

কৃশা গৌতমী থেরীর জীবনকথা বর্ণনা করার পর শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু বললেন, শুধু কৃশা গৌতমী থেরী নয়, অনেক রাজাও বুদ্ধের উপদেশ শুনে সৎ জীবন যাপন করতেন এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালনা করতেন। অনেক গুণী রাজা বুদ্ধের উপাসক এবং বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বুদ্ধের সময়ের রাজা বিম্বিসার, রাজা প্রসেনজিত, রাজা অজাতশত্রু, রাজা উদয়ন প্রমুখ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী। তাঁরা বুদ্ধকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন। তাঁরা নিয়মিত বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে চতুর্প্রত্যয় দান করতেন, বিহার দান করতেন। এছাড়া, রাজা ও অমাত্যগণ বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। সকলের গুণিজনের জীবন চরিত পাঠ করা উচিত। আমি মহৎ ব্যক্তিদের জীবন চরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলছি। আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এরপর তিনি জীবন চরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করলেন।

জীবন চরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবন অত্যন্ত দুর্লভ। মহৎ জীবন গঠন করতে পারলে এর প্রকৃত রূপ অনুভূত হয়। কিন্তু জন্মে কেউ মহৎ হয় না, কাজের মাধ্যমে এই মহত্ত্ব অর্জন করতে হয়। মহৎ মানুষের জীবনী পাঠ করলে এ বিষয়ে অনেক কিছু শেখা যায়। জগতে বিনা পরিশ্রমে কেউ মহৎ হতে পারেন না। যাঁরা মহৎ হয়েছেন তাঁদের জীবনেও সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা এবং সফলতা ও বিফলতা ছিল। কিন্তু তাঁরা নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হননি। তাঁরা জীবজগতের কল্যাণসাধনে নিজেকে উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ন্যায়ের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। সর্বদা আদর্শ জীবন যাপনের চেষ্টা করেছেন। সৎ ও ন্যায়ের পথে থেকে তাঁরা মানুষের সুখ-শান্তির জন্য কুশল কর্ম সম্পাদন করে গেছেন। জীবন চরিত পাঠে সেসব মহামনীষীর গুণাবলি এবং অবদান সম্পর্কে জানা যায়। গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠন এবং মহৎকর্ম সম্পাদন করা যায়। তাই মহৎ ব্যক্তিদের জীবনচরিত পাঠ করা উচিত।

জীবন চরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করার পর শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু সকল প্রাণীর সুখ-শান্তি কামনা করে দেশনা শেষ করেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৮

মহৎ জীবন গঠনের জন্য তুমি কী করতে পার, তা নিচে লেখো।

গুণীজনের জীবনী পড়ো, সৎ আদর্শ জীবন গড়ো।।

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাতক

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব–
- জাতক পরিচিতি;
- জাতকের প্রভাব;
- সুখ বিহারী জাতক;
- ন্যগ্রোধমৃগ জাতক।

জাতক পরিচিতি

রাজবন বিহারের অধ্যক্ষ ধর্মসেন ভিক্ষু ধর্মদেশনার সময় প্রায়ই জাতক বলেন। দায়ক-দায়িকারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর দেশনা শোনেন। একদিন এক দায়িকা তাঁকে বললেন, 'ভন্তে! আপনি যখন জাতক বলেন তখন খুব ভালো লাগে। এতে আমরা সৎ ও নৈতিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হই।' তখন ধর্মসেন ভিক্ষু বললেন, 'বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় জাতক বলতেন। মানুষকে নৈতিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি জাতক ভাষণ করতেন। আজ আমি আপনাদের জাতক কী, জাতক শুনলে বা পাঠ করলে কী উপকার হয় তা বলব। এছাড়া, দুটি জাতকও ভাষণ করব। এরপর তিনি প্রথমে জাতক সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য বলেন :

জাতক শব্দটি 'জাত' শব্দ থেকে এসেছে। 'জাত' শব্দের অর্থ হলো উৎপন্ন, উদ্ভূত, জন্ম ইত্যাদি। সুতরাং 'জাতক' শব্দের অর্থ হলো যিনি উৎপন্ন বা জন্ম লাভ করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবন বোঝাতে 'জাতক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধ ধর্মদেশনার সময় এবং বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে শিষ্যদের তাঁর অতীত জন্মের কাহিনি বর্ণনা করতেন। জাতক পাঠে জানা যায়, জন্ম-জন্মান্তরে গৌতম বুদ্ধ বিভিন্ন প্রাণীর রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, বণিক, দেবতা, পশু, পাখি, মৎস্য প্রভৃতি নানা রূপে জন্ম নিয়েছেন। জানা যায়, তিনি ৫৫০বার জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিটি জন্মে তিনি 'বোধিসত্ত্ব' নামে অভিহিত হতেন। কোনো জন্মে তিনি দান পারমী, কোনো জন্মে শীল পারমী, কোনো জন্মে প্রজ্ঞা পারমী পূর্ণ করেন। এভাবে তিনি দশ পারমী পূর্ণ করে শেষ জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মের সেই কাহিনিগুলো 'জাতক' নামে পরিচিত। বর্তমানে ৪৪৭টি জাতক পাওয়া যায়। ৩টি জাতক পাওয়া যায়নি। জাতকগুলোতে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কুশল কর্ম সম্পাদনের কথা আছে। জাতক পাঠে সেইসব কুশল কর্মের কথা জানা যায়। তাই জাতক পাঠের উপকারিতা অনেক। জাতকের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো– জাতকগুলো মানুষকে কর্মফল সম্পর্কে সচেতন করে। কুশল কর্ম সম্পাদন এবং নৈতিক ও মানবিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মের মর্মবাণী এবং জটিল ও কঠিন বিষয়গুলো সহজভাবে তুলে ধরে। এ কারণে মানব জীবনে জাতকের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর ধর্মসেন ভিক্ষু মানব জীবনে জাতকের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন এবং বলেন–

■ জাতকের প্রভাব

ভালো কাজের সুফল আর খারাপ কাজের কুফল সম্পর্কে বোঝানোর জন্য গৌতম বুদ্ধ জাতকগুলো ভাষণ করতেন। তাই সুন্দর জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব আছে। জাতকের কাহিনিগুলো মানুষকে সৎ, আদর্শবান, নীতিবান, মৈত্রীপরায়ণ, পরোপকারী, এবং মানবিক হতে শিক্ষা দেয়। কারো প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ, মিথ্যা বলা, কর্কশ ও কটু বাক্য বলা, চুরি করা, মাদকদ্রব্য সেবন প্রভৃতি থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। লোভ, তৃষ্ণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি ক্ষয় করতে অনুপ্রাণিত করে। সম্যক জীবিকা দিয়ে জীবন নির্বাহ বা পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে উৎসাহ জোগায়। সকল প্রাণীর কল্যাণ সাধন এবং আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত হওয়ার শিক্ষা দেয়। এক কথায় বলা যায়– নৈতিক, মানবিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব অপরিসীম।

জাতক পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজে বহু মানুষ দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় এবং জীবজন্তুর নিরাপত্তায় কাজ করছেন। যদি আমরা জাতকের শিক্ষা গ্রহণ করে সৌহার্দ, সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের মনোভাব সৃষ্টি করতে পারি; অপরের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি চিন্তা করতে পারি; জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি মৈত্রী-করুণা প্রদর্শন করতে পারি, তাহলে আমরা একটি সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারব।

এরপর ধর্মসেন ভিক্ষু বলেন, বর্তমানে পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ ভোগের আশায় অস্থির। যার যত বেশি আছে, সে তত বেশি চায়। তাই পৃথিবীতে লোভ, অন্যায়, অবিচার, ঘুস ও দুর্নীতি প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। এর ফলে সামাজিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার ফলে একদিকে মানুষ নীতি আদর্শ হারাচ্ছে, অপরদিকে গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তুর প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারছে না, 'ভোগে শান্তি নেই, ভোগে দুঃখ বাড়ায়। ত্যাগেই একমাত্র শান্তি।' এ কথাটি সহজভাবে বোঝানোর জন্য ধর্মসেন ভিক্ষু 'সুখ বিহারী জাতক' এবং 'ন্যগ্রোধমৃগ জাতক' ভাষণ করেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৯

জাতকের কাহিনিগুলো থেকে আমরা কী কী শিক্ষা লাভ করতে পারি, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

সুখ-বিহারী জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঘর-সংসার খুব দুঃখময়, গৃহত্যাগ বরং সুখকর– এই ভেবে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি ধ্যান করে আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। তাঁর শিষ্য হন পাঁচশ তপস্বী।

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব শিষ্যসহ হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে নগরে ও জনপদে ভিক্ষা করতে করতে বারাণসীতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি রাজার উদ্যানে অতিথি হয়ে বর্ষার চার মাস কাটিয়ে দেন। তারপর তিনি বিদায় নেওয়ার জন্য রাজার কাছে গেলেন। রাজা বললেন, আপনি বুড়ো হয়েছেন। এই বয়সে আপনি হিমালয়ে ফিরে যাবেন কেন? শিষ্যদের হিমালয়ে আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানে থাকুন।

রাজার অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বললেন, তোমার ওপর পাঁচশ শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিলাম। তুমি তাদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যাও। আমি এখানে থাকব।

বোধিসত্ত্বের এই জ্যেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন এক রাজা । রাজত্ব ছেড়ে এসে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যান। সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা ভালোভাবে থেকো। আমি একবার আচার্য গুরুদেবকে বন্দনা করে আসি।'

এই বলে বারাণসীতে গিয়ে আচার্যকে বন্দনা করে পাশে একটি মাদুর পেতে শুয়ে পড়লেন। ঠিক এ সময় তপস্বীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজাও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তপস্বীকে বন্দনা করে এক পাশে উপবেশন করলেন। নবাগত তপস্বী রাজাকে দেখেও বিছানা থেকে উঠলেন না। আয়েশ করে শুয়ে থেকে তিনি বলতে লাগলেন, 'আহা কী সুখ।' রাজা নতুন তপস্বীকে বন্দনা করার পরও তপস্বী উঠলেন না। রাজা ভাবলেন তপস্বী বোধ হয় তাকে অবজ্ঞা করছেন। কাজেই তিনি একটু বিরক্ত হলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'প্রভু, এই তপস্বী বোধ হয় খুব বেশি মাত্রায় আহার করেছেন। তা না হলে এভাবে 'আহা কী সুখ' বলেছেন কেন?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ, এই তপস্বী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন তিনি যে সুখ পেয়েছেন, তা রাজ্যসুখ ভোগ করার সময়ে পাননি। রাজ্যসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এ রকম বলেছেন। কামনা-বাসনা যার মধ্যে নেই তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনি কারও ছায়ায় নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবেন না, নিজের কিছু রক্ষা করার জন্যও চিন্তিত হন না।

এই ধর্ম-উপদেশ শুনে রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে প্রাসাদে চলে গেলেন। তপস্বীও বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে হিমালয়ে ফিরে যান। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে থেকে গেলেন। তিনি প্রাপ্ত বয়সে পূর্ণ জ্ঞানে দেহত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

উপদেশ : ত্যাগেই সুখ, ভোগে সুখ নেই।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩০

সুখবিহারী জাতক থেকে তুমি কী শিক্ষা লাভ করেছ, তা বর্ণনা করো (একক কাজ)।

■ ন্যগ্রোধমৃগ জাতক

বহু প্রাচীন কালের কথা। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হরিণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শরীর ছিল সোনা রংঙের। শিংগুলো রুপালি, মুখ লাল এবং চোখ দুটো ছিল মনিরত্নের মতো উজ্জ্বল। তিনি এক বনে পাঁচশ মৃগের দলনেতা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ন্যগ্রোধ মৃগরাজ। রাজা ব্রহ্মদত্তের ছিল হরিণের মাংসের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। হরিণের মাংস ছাড়া তাঁর আহার সম্পন্ন হতো না। তিনি প্রতিদিন বহু প্রজা সঙ্গে নিয়ে হরিণ শিকারে যেতেন। এতে প্রজাদের কাজকর্মে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটত। তারা অত্যন্ত বিরক্ত হলেও রাজাকে কিছু বলতে সাহস করত না। একদিন তারা নিজেদের মধ্যে এটি সমাধানের জন্য পরামর্শ করল। তারপর একটি সিদ্ধান্ত নিল। সেই সিদ্ধান্তমতে রাজার উদ্যানে মৃগদের আহারের জন্য তৃণ ও বৃক্ষ রোপণ করে বন তৈরি করল। কূপ ও পুকুর খনন করে জলের আয়োজন করল। তারপর রাজ্যের সকল প্রজা বনে গেল। তারা একত্রে সকল মৃগ তাড়িয়ে এনে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করাল এবং উদ্যানের দ্বার বন্ধ করে দিল।

এভাবে বহু মৃগ সংগ্রহ করে তারা রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, আপনি প্রতিদিন মৃগয়ায় গিয়ে আমাদের কাজে ব্যাঘাত করছেন। আমরা আপনার উদ্যান মৃগপূর্ণ করে রেখেছি। এখন থেকে অনুগ্রহ করে আপনি নিজে নিজে উদ্যানের মৃগ বধ করে ভোজন করতে পারেন।"

রাজা ব্রহ্মদত্ত উদ্যানে গিয়ে দেখলেন, সত্যি শত শত মৃগ উদ্যানে বিচরণ করছে। সোনালি বরণ ন্যগ্রোধ মৃগরাজকে দেখে তিনি বললেন, "তোমাকে অভয় দিলাম। তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস করো।"

তারপর কোনোদিন রাজা উদ্যানে গিয়ে নিজে শরবিদ্ধ করে মৃগ হত্যা করতেন। কোনোদিন তাঁর পাচক গিয়ে মৃগ হত্যা করে নিয়ে এসে রান্না করত। এভাবে প্রতিদিন মৃগ হত্যা করা হতো। কিন্তু ধনুকের শব্দ শোনামাত্র প্রাণভয়ে মৃগগুলো চারিদিকে ছুটাছুটি করার ফলে প্রতিদিনই বহুমৃগ শরাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করত। ন্যগ্রোধ মৃগরাজ তা দেখে ভাবলেন, নিরর্থক অনেক মৃগ নিহত হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি স্থির করলেন, পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন একেকটি মৃগ স্বেচ্ছায় প্রাণ দেবে।

একদিন এক গর্ভবতী হরিণীর পালা এসে পড়ল। হরিণী নিরূপায় হয়ে ন্যগ্রোধ মৃগরাজের কাছে গেল এবং বলল, "প্রভু! আমি গর্ভবতী। এবার আমার পালা। এ সময় আমি গেলে একসঙ্গে দুটি প্রাণ বিনষ্ট হবে। আমায় ছেড়ে দিতে অনুমতি করুন।" ন্যগ্রোধ মৃগরাজ হরিণীকে অভয় প্রদান করে ছেড়ে দিলেন। হরিণীর পরিবর্তে তিনি নিজে গিয়ে প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

যথাসময়ে পাচক এসে ন্যগ্রোধ মৃগরাজকে দেখে বিস্মিত হলো। কারণ রাজা তাঁকে অভয় দিয়েছিলেন। তিনি ঘটনাটি রাজাকে জানালেন। রাজা শোনামাত্র পাত্রমিত্রসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। তিনি ন্যগ্রোধ মৃগরাজাকে সম্বোধন করে বললেন, "সখা মৃগরাজ! আমি তো তোমায় অভয় দিয়েছিলাম। তবে তুমি কেন আজ নিজের প্রাণ দিতে হাজির হয়েছ?"

ন্যগ্রোধ মৃগরাজ উত্তর দিলেন, "মহারাজ! আজ একটি গর্ভবতী হরিণীর পালা ছিল। সে আমার সাহায্য প্রার্থনা করল। আমি তাকে অভয় প্রদান করেছি। আমি তার প্রাণ রক্ষার্থে আরেকজনের প্রাণ বিনাশ করতে পারি না। তাই তার পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছি।"

রাজা ন্যগ্রোধ মৃগরাজের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন, "মৃগরাজ! তুমি আজ তোমার প্রজাদের জন্য যে মৈত্রী, প্রীতি ও দয়ার পরিচয় দিলে, তা মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। আমি প্রসন্নমনে তোমাকে ও সেই গর্ভবতী হরিণীকে অভয় দিলাম।"

মহারাজ! দুটি মাত্র মৃগ অভয় পেল, অবশিষ্টদের ভাগ্যে কী হবে?

-আমি অবশিষ্ট মৃগদেরও অভয় দিলাম।

-আপনার উদ্যানের সকল মৃগ নিঃশঙ্ক হলো, কিন্তু অন্যান্য মৃগদের কী হবে?

-আমি তাদেরও অভয় দিলাম।

-মৃগকুল নিস্তার পেল, কিন্তু অবশিষ্ট চতুষ্পদ প্রাণীদের কী হবে?

-আমি তাদেরকেও অভয় প্রদান করলাম।

-চতুষ্পদ প্রাণী রক্ষা পেল, কিন্তু পাখিদের কী হবে?

-আমি পাখিদেরও অভয় দিলাম।

-পাখিরা অভয় পেল বটে, কিন্তু মৎস্যাদি জলচরদের কী হবে?

-মৎস্যাদি জলচরদেরও অভয় দিলাম।

এভাবে রাজা ব্রহ্মদত্তের কাছ থেকে ন্যগ্রোধ মৃগরাজ সকল প্রাণীর জন্য অভয় পেলেন। তারপর তিনি রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়ে বললেন, "মহারাজ, ধর্মপথে চলুন, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, গৃহী, সন্ন্যাসী, পৌর জনপদ সকলের সঙ্গে যথাধর্ম নিরপেক্ষভাবে আচরণ করুন। তাহলে যখন দেহত্যাগ করবেন তখন দেবলোকপ্রাপ্ত হবেন।" ন্যগ্রোধ মৃগরাজ রাজাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করে আরও কিছুদিন উদ্যানে বসবাস করে অনুচরগণসহ অরণ্যে ফিরে গেলেন। তারপর থেকে রাজা ব্রহ্মদত্ত আর কোনোদিন মৃগমাংস আহার করেননি।

উপদেশ : জীবন সকলের কাছে প্রিয়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩১

কেস স্টাডি : নিচের দৃশ্যপট দুটি পড়ার পর নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দৃশ্যপট-১	দৃশ্যপট-২
একগ্রামে একজন লোক অতীব ধর্মপরায়ণ। সৎ জীবিকা দ্বারা তিনি সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে দিন যাপন করেন। তার কোনো লোভ-লালসা নেই। সব সময় ত্যাগের মনোভাব নিয়ে চলেন। বেশি ধন-সম্পদ লাভের দিকে তাঁর প্রচেষ্টা নেই। সৎপথে থেকে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।	ঐ গ্রামে আরেকজন ব্যক্তি আছেন যিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক। প্রতিনিয়ত তার ধন-সম্পত্তির দিকে লোভ। মানুষকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে সে শুধু নিজেই বিত্তশালী হতে চায়। ধর্ম-কর্মের প্রতি তার কোনো চেতনা নেই। তার সন্তানরাও তার মতো হয়ে গড়ে উঠছে।

ক) দৃশ্যপট-১ ও দৃশ্যপট-২ -এর মধ্যে কে ত্যাগী?

খ) প্রথম ব্যক্তি ও দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?

গ) দুই ব্যক্তির মধ্যে তুমি কাকে বেশি শ্রদ্ধা করবে? কেন, তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) প্রথম ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করলে সমাজের কী উপকার হতে পারে, মতামত দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩২

গল্প বলা ও কেস স্টাডি অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও।

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?

কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

ফিরে দেখা : নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না ঘরে (✔) চিহ্ন দাও :

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
২৫		
২৬		
২৭		
২৮		
২৯		
৩০		
৩১		
৩২		

মন দিয়ে জাতক পড়ি, সৎ গুণের চর্চা করি।।

সপ্তম অধ্যায়

বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব–

- মধু পূর্ণিমা;
- মধু পূর্ণিমা প্রেক্ষাপট;
- মধু পূর্ণিমার শিক্ষা ও সামাজিক গুরুত্ব;
- প্রবারণা পূর্ণিমা;
- প্রবারণা পূর্ণিমার বিশেষত্ব;
- প্রবারণা পূর্ণিমার শিক্ষা;
- প্রবারণা পূর্ণিমার সামাজিক গুরুত্ব।

উ-চিন মং বান্দরবানের একটি স্কুলে পড়ে। সৌম্য বড়ুয়া ও উদয় চাকমা তার প্রিয় বন্ধু। তারা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। তারা একত্রে বৌদ্ধ বিহারে যায় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তারা বেশ কৌতূহলী। একদিন তারা শ্রেণি শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান কী?' শ্রেণি শিক্ষক বললেন, বৌদ্ধদের ধর্মীয় সংস্কার এবং শাস্ত্রের নির্দেশনা অনুসারে পালনীয় অনুষ্ঠানগুলো হলো বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান। যেমন– মধু পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, সংঘদান ইত্যাদি বৌদ্ধদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। তখন উ চিন মং বলল, মধু পূর্ণিমা আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হবে। কীভাবে এ পূর্ণিমা পালন করা হয়, তা আমাদের জানা উচিত। তারা বিষয়টি জানার জন্য একদিন সন্ধ্যায় বিহারে গিয়ে ভিক্ষুকে বন্দনা নিবেদন করে মধু পূর্ণিমা পালনের কারণ জানতে চাইল। ভিক্ষু প্রশান্তচিত্তে তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করলেন।

প্রত্যেক পূর্ণিমা তিথির সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবনের অনেক মহৎ ঘটনা জড়িত। সেই ঐতিহাসিক মহৎ ঘটনা অনুসারে অনেক পূর্ণিমা দিবসের নতুন নামকরণ হয়েছে। যেমন– বৈশাখী পূর্ণিমা। জন্ম, বুদ্ধত্ব এবং মহাপরিনির্বাণ লাভ–বুদ্ধের জীবনের এই তিনটি মহৎ ঘটনা বৈশাখী পূর্ণিমায় সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে পরিচিত। তখন সৌম্য বলল, 'ভন্তে আমরা মধু পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা সম্পর্কে জানতে চাই।' ভিক্ষু বললেন, 'বেশ, আজ আমি তোমাদের মধু পূর্ণিমা এবং প্রবারণা পূর্ণিমা সম্পর্কে বলব।'

মধু পূর্ণিমা

মধু পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় তিথি, একটি পুণ্যময় বৌদ্ধপর্ব এবং তাৎপর্যসম্পন্ন ধর্মীয় উৎসব। অন্যান্য পূর্ণিমার মতো 'মধু পূর্ণিমা' তিথিও বৌদ্ধরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করে । মধু পূর্ণিমা ভাদ্র মাসে পালিত হয়। এই পূর্ণিমার সঙ্গেও গৌতম বুদ্ধের জীবনের এক মহৎ ঘটনা জড়িত।

এই পূর্ণিমায় পারলিয়্যি বনে অবস্থানকালে বুদ্ধকে এক বানর মধু দান করেছিল এবং সেই দানের ফলে মৃত্যুর পর বানরটি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে। সেই পুণ্যময় ঘটনার কারণে ভাদ্র পূর্ণিমা মধু পূর্ণিমা নামে পরিচিতি লাভ করে। এরপর, তিনি মধু পূর্ণিমার প্রেক্ষাপট বলতে আরম্ভ করলেন।

প্রেক্ষাপট : মধু পূর্ণিমার একটি গৌরবময় প্রেক্ষাপট রয়েছে। এটি হলো গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। তখন বুদ্ধ দশম বর্ষাবাস পালনকালে কৌশাম্বীতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে অনেক ভিক্ষু ছিলেন।

একদিন একটি তুচ্ছ বিষয়ে ভিক্ষুদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। বিষয়টি ক্ষুদ্র হলেও বিবাদ চরম আকার ধারণ করে এবং ভিক্ষুসংঘ দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একই বিহারে অবস্থান করা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের ভিক্ষুগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। ভিক্ষুদের এই অশান্ত ও অমৈত্রীপূর্ণ আচরণ বুদ্ধের অন্তরে পীড়া দেয়। মহাকারুণিক বুদ্ধ উভয় পক্ষের ভিক্ষুদের আহ্বান করে বিবাদ নিরসনের পরামর্শ দেন। করুণা ও মৈত্রী অনুসরণের উপদেশ দেন। কিন্তু ভিক্ষুসংঘ বিবাদ প্রশমনে ব্যর্থ হন। ভিক্ষুদের এই অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণে বুদ্ধ নিজে বিবাদরত ভিক্ষুদের সঙ্গ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নীরবে নিভৃতে কৌশাম্বী ছেড়ে একাকী পারলিয়্যি বনে চলে যান।

বুদ্ধকে বানরের মধু দান

সেখানে নির্জনে বসবাসকালে বহু প্রাণীর সঙ্গে বুদ্ধের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুদ্ধের মৈত্রীময় জীবনাচার বন্যপ্রাণীদের আকৃষ্ট করে। সকল প্রাণী বুদ্ধের সেবায় এগিয়ে আসে। সে সময় এক হাতি বুদ্ধকে নানারকম ফলমূল দিয়ে সেবা করতে থাকে। তা দেখে এক বানরের মনেও সেবার ইচ্ছা জাগে। সেদিন ছিল ভাদ্র পূর্ণিমা। বানরটি এক মৌচাক সংগ্রহ করে এনে বুদ্ধকে দান করল। বুদ্ধ সন্তুষ্ট চিত্তে সেই দান গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ দান গ্রহণ করায় বানরটি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়। দান ও ত্যাগের মাধ্যমে যে পারস্পরিক প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে এটি একটি বন্যপ্রাণীও বুঝতে পেরেছিল। পরে এই বানর ত্যাগের মহিমায় উৎফুল্ল চিত্তে মৃত্যুবরণ করে দেবলোকে জন্ম নেয়। এদিকে, বুদ্ধের কৌশাম্বী ত্যাগের কারণে ভিক্ষুসংঘ ও গ্রামবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা সম্মিলিত হয়ে বুদ্ধকে ফিরিয়ে নিতে তৎপর হয়।

বুদ্ধকে সেবা করছে একটি বন্য হাতি

পরিশেষে ভিক্ষুসংঘ নিজেদের ভুল বুঝতে সক্ষম হন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সবাই সম্মিলিতভাবে এসে বুদ্ধের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বুদ্ধকে কৌশাম্বীর বিহারে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এ সময় মহাকারুণিক বুদ্ধের কাছে বন্যপ্রাণীদের মৈত্রীসুলভ আচরণ, সহাবস্থান এবং দানবৃত্তির কথা শুনে সবার মৈত্রীচিত্ত উৎপন্ন হয়। বিবাদগ্রস্ত ভিক্ষুসংঘ এবং দায়ক-দায়িকাগণ উপলব্ধি করলেন, পারস্পরিক মৈত্রীবোধ ও সম্প্রীতির জন্য প্রয়োজন আত্মনিয়ন্ত্রণ। সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত শান্তি নিহিত। এ ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখা এবং বুদ্ধের শিক্ষা-মৈত্রী ও করুণা অনুশীলনের জন্য প্রতিবছর ধর্মীয় চেতনায় মধু পূর্ণিমা পালন করা হয়।

এটুকু বলার পর ভিক্ষু বললেন, এখন আমি মধু পূর্ণিমার শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৩

তোমার দেখা একটি মধু পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।

মধু পূর্ণিমার শিক্ষা : মধু পূর্ণিমার সঙ্গে বুদ্ধ, ভিক্ষুসংঘ, দায়ক-দায়িকা এবং প্রাণিকুলের সুসম্পর্কের বিষয়টি জড়িত। তাই মধু পূর্ণিমার শিক্ষা বহুমুখী। মধু পূর্ণিমা মানুষকে ধৈর্য ও সহনশীল, পরোপকারী, সেবাপরায়ণ, উদার, পরমতসহিষ্ণু এবং মৈত্রী ও করুণাপরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়; সম্প্রীতির মাধ্যমে সহাবস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। প্রাণিকুলের প্রতি সদয় আচরণের প্রেরণা জোগায়। রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, বিবাদ, অহংকার পরিহারের প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের শিক্ষা দেয়।

মধু পূর্ণিমার শিক্ষা সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ভিক্ষু তাদেরকে দীর্ঘায়ু কুমারের কাহিনিটি বর্ণনা করেন। এ কাহিনি তথাগত বুদ্ধ বিবাদ-বিভক্তি মোচনের জন্য বলেছিলেন।

দীর্ঘায়ু কুমার ছিলেন কোশলরাজ দীঘীতির পুত্র। রাজা পুত্রকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সব সময় সৎ উপদেশ দিতেন। পুত্র দীর্ঘায়ু কুমার পিতার উপদেশ মানতেন। একদিন রাজা উপদেশ দিয়ে বললেন, ''দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব দেখিও না; বৎস দীর্ঘায়ু! বৈরিতার দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় না, বরং অবৈরিতার দ্বারা বৈরিতার উপশম হয়।'' পুত্র পিতার উপদেশ পালন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। একদিন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ু কুমারের পিতা-মাতাকে হত্যা করে কোশল রাজ্য দখল করে নেন। পিতা-মাতার শোকে দীর্ঘায়ু কুমারের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এক সময় দীর্ঘায়ু কুমার কাশীরাজের কর্মচারী হয়ে রাজার কাছে আসার সুযোগ লাভ করলেন। একদিন ঘুমন্ত রাজাকে একা পেয়ে তিনি প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলেন। তিনি কয়েকবার হত্যার উদ্যোগ নেন। কিন্তু পিতার উপদেশ মনে পড়ে যাওয়ায় প্রতিবারই তিনি রাজাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হন। ইতোমধ্যে রাজা ঘুম থেকে জেগে যান এবং তলোয়ার হাতে দীর্ঘায়ু কুমারকে দেখে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। রাজা দীর্ঘায়ু কুমারকে তলোয়ার হাতে শোবার ঘরে প্রবেশ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দীর্ঘায়ু কুমার বললেন, "আমি পিতা-মাতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলাম। কিন্তু পিতার উপদেশ মনে পড়ে যাওয়ায় আমি আপনাকে হত্যা করতে পারছিলাম না।" এরপর, রাজা পিতার উপদেশের মর্মার্থ জানতে চাইলে দীর্ঘায়ু কুমার বলেন, "আমার পিতা বলেছিলেন, চিরকাল কারো সাথে শত্রুতা করবে না। হঠাৎ মিত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবে না। শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার অবসান হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। তাই কখনো প্রতিশোধপরায়ণ হয়ো না। প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে হত্যা কোরো না।" কাশীরাজ দীর্ঘায়ু কুমারের এরকম পিতৃভক্তি ও কর্তব্যবোধ উপলব্ধি করে খুব প্রসন্ন হন। তিনি কোশল রাজ্য দীর্ঘায়ু কুমারের কাছে হস্তান্তর করেন। তারপর তাঁর কন্যাকে দীর্ঘায়ু কুমারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে উভয়ের সম্পর্ক আরও মৈত্রীপূর্ণ করেন।

ভিক্ষু পুনরায় বললেন, কলহ ও রাগের প্রভাব জন্ম-জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। এতে ক্ষতি ছাড়া কোনো প্রকার মঙ্গল হয় না। তাই কলহ, রাগ ও হিংসা সর্বদা পরিত্যাজ্য। দীর্ঘায়ু কুমারের শিক্ষা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং অনুসরণযোগ্য। এরপর ভিক্ষু মধু পূর্ণিমার সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে দেশনা করেন।

মধু পূর্ণিমার সামাজিক গুরুত্ব : মধু পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা বিহারে গিয়ে একসঙ্গে ধর্মীয় আচরণগুলো পালন করে। দান, শীল ও ভাবনা চর্চা করে। ধর্মালোচনা ও বুদ্ধকীর্তন শোনে। ফলে তাদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে, আত্মশুদ্ধি হয়। বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে ধর্মময় আদর্শ জীবন যাপনের চেতনা জাগে। হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও কলহ-বিবাদের অসারতা উপলব্ধি করে কুশল কর্ম সম্পাদনে অনুপ্রাণিত হয়। সৃষ্টি হয় মানবসেবার মনোভাব। ফলে সমাজে অনৈক্য-বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে ঐক্য ও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মধু পূর্ণিমার প্রেক্ষাপট জেনে উ চিন মং, সৌম্য বড়ুয়া ও উদয় চাকমা খুব সন্তুষ্ট হয়। তারা এবার প্রবারণা সম্পর্কে জানার উৎসাহবোধ করে। ভিক্ষু তাদের উৎসাহ দেখে প্রবারণা পূর্ণিমা সম্পর্কেও দেশনা করেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৪

মধু পূর্ণিমার শিক্ষা আমাদের জীবনে কী উন্নয়ন ঘটাতে পারে বলে তুমি মনে করো, তা লেখো।

প্রবারণা পূর্ণিমা

প্রবারণা পূর্ণিমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভিক্ষু বললেন :

প্রবারণা শব্দের অর্থ : প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহ্যসমৃদ্ধ তিথি। 'প্রবারণা' শব্দের অর্থ হলো প্রকৃষ্টরূপে বরণ ও বারণ করা। অর্থাৎ, যা শোভন, সত্য, সুন্দর এবং সকলের জন্য মঙ্গলকর তা প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা এবং যা অশোভন, অসত্য, অকল্যাণকর তা প্রকৃষ্টরূপে বারণ করা বা তা করা থেকে বিরত থাকা। প্রবারণা পূর্ণিমায় ভিক্ষুসংঘের অনেক বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করতে হয়। এটি তাঁদের তিন মাস বর্ষাবাস অধিষ্ঠানের পূর্ণতার তিথি, যে অধিষ্ঠানের সূচনা হয় আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বা আষাঢ়ী পূর্ণিমায়। সাধারণ গৃহী বৌদ্ধরাও উপোসথ তিথি হিসেবে এই পূর্ণিমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে উদ্‌যাপন করেন। এ সময় বিহারে বিহারে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ভিক্ষুসংঘ ও গৃহী বৌদ্ধরা একসঙ্গে এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে সকল প্রকার কলুষতা ত্যাগ করে সবাই আত্মশুদ্ধির চেতনায় উদ্ভাসিত হয়।

প্রবারণা উপলক্ষ্যে ফানুস ওড়ানো

প্রবারণা পূর্ণিমার বিশেষত্ব : আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়। এর তিন মাস আগে পালিত হয় আষাঢ়ী পূর্ণিমা। তথাগত বুদ্ধ আত্মশুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা অনুশীলনের জন্য ভিক্ষুসংঘকে আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস বর্ষাবাস পালনের আদেশ দিয়েছিলেন। এটি ভিক্ষুসংঘের 'ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস' নামে খ্যাত। তাই আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমা ভিক্ষুসংঘের জন্য সংযম ও আত্মশুদ্ধির পূর্ণতার পর্ব। এদিন ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হয়। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে জানা-অজানা কারণে সংঘটিত ভুলত্রুটি স্বীকার করেন এবং পরস্পরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের পরিশুদ্ধ করেন। এটি মূলত ভিক্ষুসংঘের বিনয়বিধিমূলক একটি অনুষ্ঠান। এজন্য প্রবারণা পূর্ণিমাকে আত্মশুদ্ধি অনুশীলনের এক অনন্য অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। গৃহীরাও প্রাচীনকাল থেকে এই পর্বকে চিত্তশুদ্ধি ও উপোসথ ব্রতচর্চার অনন্য অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করে আসছে।

এই পূর্ণিমার আরে একটি বিশেষত্ব হলো– গৌতম বুদ্ধ এই পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষাবাস পালনশেষে ভিক্ষুসংঘকে ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! বহু জনের হিত ও সুখের জন্য, দেব মানবের কল্যাণের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো, প্রচার করো সেই ধর্ম, যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে বা শেষে কল্যাণ।" বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে সেদিন ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধবাণী প্রচারের জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনো ভিক্ষুসংঘ সকলের হিত ও কল্যাণের কথা ভেবে বিভিন্ন বিহারে সমবেত হয়ে তথাগত বুদ্ধের উপদেশবাণী প্রচার করেন। প্রবারণা পূর্ণিমার শেষে বিহারে বিহারে এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় 'কঠিন চীবর দান'। কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুসংঘ ও দায়ক-দায়িকাদের মধ্যে এক মহাসমাবেশ ঘটে। ধর্মালোচনা ও পুণ্যকর্মের জন্য এই অনুষ্ঠান ও তিথি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন আকৃতির ফানুস

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৫

তোমার দেখা প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের ভূমিকাভিনয় করো/নাটক মঞ্চস্থ করো।

প্রবারণা পূর্ণিমার বিশেষত্ব বর্ণনা করার পর ভিক্ষু তাদের প্রবারণা পূর্ণিমার সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

প্রবারণা পূর্ণিমার সামাজিক গুরুত্ব : প্রবারণা পূর্ণিমার ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামাজিক সংস্কৃতিও সম্পৃক্ত। এই সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। প্রবারণা পূর্ণিমা একটি উৎসবময় তিথি। এ তিথিকে কেন্দ্র করে ফানুস ওড়ানোর আয়োজন করা হয়। ফানুস ওড়ানো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। সকলেই আনন্দ লাভ করে। ফলে এটি বাঙালির এক চিরায়ত উৎসবে পরিণত হয়েছে। তাই প্রবারণা পূর্ণিমাকে বলা চলে অসাম্প্রদায়িক, সর্বজনীন এবং সম্প্রীতির উৎসব।

ফানুস ওড়ানোর আগে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি অনুসরণ করা হয়। এ সময় বুদ্ধকীর্তনসহ বিভিন্ন শিক্ষণীয় অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। যেমন– প্রথমে অনুষ্ঠানমণ্ডপ সাজানো হয় বিভিন্ন শৈল্পিক উপকরণ দিয়ে। এর মাধ্যমে অন্তরের সুপ্ত শিল্পচেতনা বিকাশের সুযোগ হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের গুরুজন এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের আগমন ঘটে। তাঁদের উপদেশ শুনে মানুষ আদর্শ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই প্রবারণা পূর্ণিমা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিক প্রভাব রয়েছে।

সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পর ভিক্ষু প্রবারণা পূর্ণিমার শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে দেশনা করতে গিয়ে বলেন–

প্রবারণা পূর্ণিমার শিক্ষা : প্রবারণা পূর্ণিমার শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রবারণা পূর্ণিমা আত্মশুদ্ধি, সংযম, বিনয়, এবং ক্ষমাশীলতার শিক্ষা দান করে। কুশলকে বরণ এবং অকুশলকে বারণের শিক্ষা দেয়। আত্মশুদ্ধি চর্চায় নির্দোষ, সৎ ও আদর্শ জীবন গঠন করা যায়। সংযম ও বিনয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, সদাচার ও পরোপকার সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। ক্ষমাশীলতা মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা রাগ, দ্বেষ ও হিংসা প্রশমিত করে। প্রত্যেক মানুষ যদি ক্ষমাশীলতা অনুশীলন করে পরস্পরের কাছে নিজ দোষত্রুটি স্বীকার করে এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য প্রভৃতি দূর হয়ে যায়। অপরদিকে, আন্তরিকতা ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এছাড়া, কুশল কর্ম সম্পাদন এবং অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকার মাধ্যমে সমাজে শান্তি বিরাজ করতে পারে। এভাবে প্রবারণা পূর্ণিমার শিক্ষা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করে তুলতে সাহায্য করে।

প্রবারণা পূর্ণিমার সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পর ভিক্ষু সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করে দেশনা শেষ করেন। উ চিন মং, সৌম্য বড়ুয়া এবং উদয় চাকমা পূর্ণিমা উৎসবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব প্রভৃতি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়। এরপর তারা ভিক্ষুকে বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে পূর্ণিমার শিক্ষা অনুশীলনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৬

প্রবারণা পূর্ণিমার শিক্ষা আমাদের জীবনে কী উন্নয়ন ঘটাতে পারে, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৭

তোমার দেখা প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও ছবির প্রদর্শনী করো। (সম্মিলিত কাজ–চিত্রশালা)

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৮

নাটক মঞ্চস্থ ও ছবির প্রদর্শনী/চিত্রশালা অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম : নাটক মঞ্চস্থ ও ছবির প্রদর্শনী/চিত্রশালা

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)।

কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ/ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

ফিরে দেখা : নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না ঘরে (✔) চিহ্ন দাও :

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
৩৩		
৩৪		
৩৫		
৩৬		
৩৭		
৩৮		

আচার-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি, বাড়ায় সৌহার্দ-সম্প্রীতি।।

অষ্টম অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা নিতে পারব–

- সূত্র ও নীতিগাথা;
- খুদ্দক পাঠ ও ধর্মপদের পরিচয়;
- মঙ্গলসূত্রের পটভূমি;
- মঙ্গলসূত্র;
- মঙ্গলসূত্রের শিক্ষা;
- দণ্ডবর্গের পটভূমি;
- দণ্ডবর্গ;
- দণ্ডবর্গের শিক্ষা।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচারের সময় বিভিন্ন সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করেছেন। এসব সূত্র ও নীতিগাথায় মঙ্গলকর্ম সম্পাদন এবং নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশনা আছে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকে নীতিগাথাগুলো সংকলিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে খুদ্দকপাঠ ও ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচিতি, মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গের পটভূমি, বিষয়বস্তু ও শিক্ষা সম্পর্কে জানব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৯

গৌতম বুদ্ধের যেসব সূত্র ও বাণী তুমি জানো, তা নিচে লেখো :

____

____

____

____

____

____

____

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নাও]

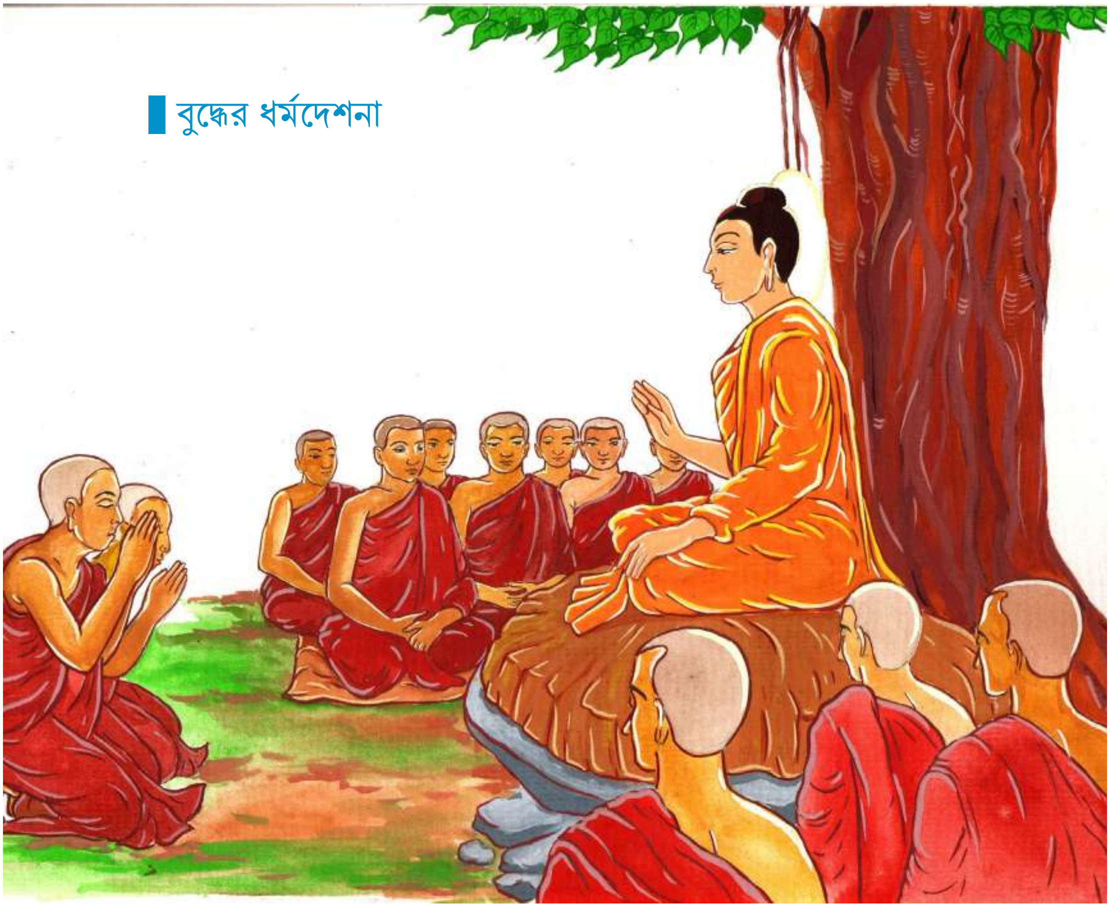

বুদ্ধের ধর্মদেশনা

খুদ্দক পাঠ ও ধর্মপদ

বুদ্ধের উপদেশগুলো ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত আছে। বুদ্ধ দেশিত সূত্রগুলো ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্র পিটকে পাওয়া যায়। খুদ্দক পাঠ গ্রন্থটি খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ। 'খুদ্দক পাঠ' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র বা সংক্ষিপ্ত পাঠ। গ্রন্থটিকে 'হস্ত মালিকা' বা 'প্রার্থনা পুস্তক'ও বলা হয়। এই গ্রন্থে নয়টি পাঠ আছে। এর মধ্যে চারটি পাঠ খুবই ছোট। মঙ্গল সূত্র এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। অপরদিকে, 'ধর্মপদ' খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ২৬টি বর্গ বা অধ্যায়ে ৪২৩টি গাথা আছে। ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার জন্য গ্রন্থ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর, মহৎ ও কাব্যময় ভাবের পরিচয় ধর্মপদে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের জন্য রচিত হলেও এর আবেদন সব মানুষের জন্য। তাই বলা চলে, ধর্মপদের শিক্ষা সর্বকালের ও বিশ্বজনের।

মঙ্গলসূত্রের পটভূমি

'মঙ্গল' শব্দের অর্থ শুভ বা ভালো। আমরা নিজের ও অন্যের ভালো হোক– এই কামনা করি। একে মঙ্গল কামনা বলে। মানুষ নানা রকম আচরণ বা চিহ্নকে মঙ্গল ও অমঙ্গলসূচক মনে করে। যেমন– কোনো কাজে

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অনেকে ডান পা আগে বাইরে দেওয়াকে মঙ্গল মনে করে। অনেকে ভরা কলসসহ মেয়ে দেখলে মঙ্গাল বা শুভ হয় বলে মনে করে। অনেকে কাক ডাকলে অশুভ মনে করে ইত্যাদি।

বুদ্ধের সময়েও কীসে মঙ্গাল হয়, তা নিয়ে তর্ক চলত। এক সময় মানুষের পাশাপাশি দেবতাদের মধ্যেও কীসে মঙ্গাল হয়, তা নিয়ে তর্ক দেখা দেয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে যান। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের কথা শুনে 'কীসে মঙ্গাল হয়' তা জানার জন্য একজন দেবপুত্রকে বুদ্ধের কাছে পাঠান। তখন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। দেবপুত্রসহ অন্য দেবতারা বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে 'কীসে মঙ্গাল হয়' জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বুদ্ধ তাঁদের মঙ্গাল সূত্র দেশনা করেন। তিনি মঙ্গালসূত্রে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গালের কথা বলেন। এভাবেই 'মঙ্গালসূত্রের' উৎপত্তি হয়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪০

নিচের QR codeটি স্ক্যান করে মঙ্গাল সূত্র পাঠের অডিয়োটি শোনো ও পাঠের চেষ্টা করো।
(একক কাজ/দলগত কাজ)

https://www.youtube.com/watch?v=8FK8luSnq8g

মঙ্গালসূত্র (পালি ও বাংলা)

১. বহু দেবা মনুস্‌সা চ, মঙ্গালানি অচিন্তযুং
আকঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রুহি মঙ্গালমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ: বহু দেবতা ও মানুষ স্বস্তি কামনা করে কীসে মঙ্গাল হয়, তা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু কীসে মঙ্গাল হয়, তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। আপনি দয়া করে দেবতা ও মানুষের মঙ্গালসমূহ ব্যক্ত করুন।

২. অসেবনা চ বালানং, পন্ডিতানং চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীযানং, এতং মঙ্গালমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : মূর্খ লোকের সেবা না করা জ্ঞানী লোকের সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গাল।

৩. পতিরূপদেসবাসো চ পুঞ্ঞে চ কতপুঞ্ঞ্ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : (ধর্মমত পালনের উপযোগী) প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা ও নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা উত্তম মঙ্গল।

৪. বাহুসচ্চঞ্চ, সিপ্পঞ্চ, বিনযো চ সুসিক্খিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : বহু শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা উত্তম মঙ্গল।

৫. মাতাপিতু উপট্ঠানং,পুত্তাদারস্স সঙ্গাহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : মাতা ও পিতার সেবা করা, স্ত্রী ও পুত্রের উপকার করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম মঙ্গল।

৬. দানঞ্চ ধম্মচরিযা চ ঞাতকানঞ্চ সঙ্গাহো,
অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণের উপকার করা এবং সদ্ধর্মে অপ্রমত্ত থাকা উত্তম মঙ্গল।

৭. আরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো,
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : কায়িক ও মানসিক পাপকাজে অনাসক্ত, শারীরিক ও বাচনিক পাপ থেকে বিরত, মদ্যপানে বিরত থাকা এবং অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উত্তম মঙ্গল।

৮. গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা,
কালেন ধম্মসবণং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল।

৯. খন্তী চ সোবচস্সতা, সমণানঞ্চ দস্সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : ক্ষমাশীল হওয়া, গুরুজনের আদেশ পালন করা, শ্রমণদের দর্শন করা, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল।

১০. তপো চ ব্রহ্মচরিযঞ্চ অরিযসচ্চান দস্‌সনং,
নিব্বানং সচ্ছিকিরিয়া চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : তপশ্চর্য ও ব্রহ্মচর্য পালন করা, চার আর্যসত্য হৃদয়ঙ্গম করা এবং পরম নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উত্তম মঙ্গল।

১১. ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।।

বাংলা অনুবাদ : লাভ ও অলাভ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ– এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা; শোক না করা, লোভ, দ্বেষ ও মোহের মতো কলুষতা থেকে মুক্ত থাকা এবং নিরাপদ থাকা উত্তম মঙ্গল।

১২. এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা,
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।।

বাংলা অনুবাদ: এসব মঙ্গলকর্ম সম্পাদন করলে সর্বত্র জয় লাভ করা যায় এবং সর্বত্র নিরাপদ থাকা যায়, এগুলো তাঁদের (দেব-মনুষ্যের) উত্তম মঙ্গল।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪১

মঙ্গলসূত্রে যেসব মঙ্গলকর্মের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে যে কয়টি তুমি পালন করো তার তালিকা তৈরি করো।

মঙ্গলসূত্রের শিক্ষা

মঙ্গলসূত্রে ৩৮ প্রকার শিক্ষণীয় বিষয় আছে। মঙ্গলসূত্রের শিক্ষা থেকে জানা যায় যে, অজ্ঞানী ব্যক্তির সেবা না করে জ্ঞানী ব্যক্তির সেবা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উচিত। প্রতিরূপ দেশে বসবাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা, নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, বহু শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা, বিভিন্ন রকম শিল্পকর্ম শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা উচিত। মাতা-পিতার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্র, জ্ঞাতিগণের উপকার করা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা, ক্ষমাশীল হওয়া, গুরুজনের আদেশ মান্য করা, নিষ্পাপ কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, যথাসময়ে দান দেওয়া ও ধর্ম চর্চা করা এবং সদ্ধর্মে অবিচল থাকা উচিত। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা, গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে জীবনযাপন করা, চতুরার্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করা ও নির্বাণ লাভ করা উত্তম মঙ্গল। এ ছাড়া আট প্রকার লোকধর্ম, যথা : লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতে অবিচল থাকা এবং লোভ-দ্বেষ-মোহ থেকে দূরে থাকা উত্তম মঙ্গল। তাই মঙ্গল সূত্রে বর্ণিত শিক্ষাসমূহ আমাদের একান্তভাবে চর্চা করা উচিত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪২

মঙ্গলসূত্র থেকে মঙ্গলকর্ম সম্পর্কে যা জানলে, তার মধ্যে যেসব মঙ্গলকর্ম পূর্ব থেকেই নিয়মিত অনুশীলন করছ তার পরিচয় দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৩

এই পাঠ থেকে নতুন যা শিখলে, তা প্রতিদিন নিজ জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে তার পরিকল্পনা করো ও নিচে লেখো।

■ দণ্ডবর্গের পটভূমি

বুদ্ধ এক সময় জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বাগানে বসবাস করছিলেন। সে সময় কয়েকজন ভিক্ষু বসা ও শোয়া সংক্রান্ত অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ক্রমে সেই বিবাদ হাতাহাতি ও মারামারিতে রূপ নেয়। ভিক্ষুদের ঝগড়া-বিবাদের বিষয়টি বুদ্ধকে জানানো হয়। তখন বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে ডেকে দণ্ডের পরিণতি বা কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দেন। বুদ্ধের সেই উপদেশসমূহ 'দণ্ডবর্গ' নামে পরিচিত। বুদ্ধের উপদেশ শুনে ভিক্ষুগণ দণ্ডের অসারতা বুঝতে পারেন। তাঁরা শিখলেন, হিংসাকে হিংসা দিয়ে জয় করা যায় না। দণ্ড ও হিংসার পরিবর্তে শত্রুকে মৈত্রী-ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে হয় এবং সেই জয়ই প্রকৃত জয়। ভিক্ষুগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং বিবাদ মীমাংসা করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। এই হলো দণ্ডবর্গের উৎস বা উৎপত্তি কথা।

দণ্ডবর্গ (পালি ও বাংলা)

১. সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বে ভাষন্তি মচ্চুনো,
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতযে।
বাংলা অনুবাদ : সবাই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে আঘাত কিংবা হত্যা কোরো না।

২. সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বেসং জীবিতং পিযং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতযে।
বাংলা অনুবাদ : সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সবার প্রিয়, সুতরাং নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে প্রহার কিংবা আঘাত কোরো না।

৩. সুখকামানি ভুতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।
বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যে সুখপ্রত্যাশী প্রাণীগণকে দণ্ড দেয়, সে কখনো সুখ লাভ করতে পারে না।

৪. সুখকামানি ভুতানি যো দণ্ডেন হিংসতি,
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সে লভতে সুখং।
বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যিনি অপর সুখকামী প্রাণীগণকে দণ্ড দেন না, তিনি নিশ্চয়ই সুখ লাভ করবেন।

৫. মা' বোচ ফরুসং কঞ্চি বুত্তা পটিবদেয্যু তং,
দুক্‌খাহি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয্যু তং।
বাংলা অনুবাদ : কাউকে কটু কথা বলবে না। যাকে কটু কথা বলবে, সে-ও তোমাকে কটু কথা বলতে পারে। ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখকর, সেজন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকে স্পর্শ করবে।

৬. সচে নেরেসি অত্তানং কংসো উপহতো যথা,
এস পত্তো'সি নিব্বানং সারম্ভো তে ন বিজ্জতি।

বাংলা অনুবাদ : আঘাত পাওয়া কাঁসার মতো যদি নিজেকে সহনশীল রাখতে পারো, তবেই তুমি নির্বাণ লাভ করবে, ক্রোধ থেকে জন্ম নেওয়া বাদবিসম্বাদ আর থাকবে না।

৭. যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুং পাচেন্তি পাণিনং।

বাংলা অনুবাদ : রাখাল যেমন দণ্ডাঘাতে গরু তাড়িয়ে গোচারণভূমিতে নিয়ে যায়, সেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

৮. অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্ঝতি,
সে হি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্গিদড্ঢো'ব তপ্পতি।

বাংলা অনুবাদ : নির্বোধ লোক পাপকাজ করার সময় তার ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, সুতরাং দুষ্ট লোক নিজের কর্মের দ্বারা আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা ভোগ করে।

৯. যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু অপ্পদুট্ঠেসু দুস্সতি,
দসন্নমঞ্ঞতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি।

বাংলা অনুবাদ : অদণ্ডনীয় (নির্দোষ) ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি দণ্ড প্রদান করে, সে ব্যক্তি সহসা দশবিধ অবস্থার মধ্যে অন্যতর (অবস্থা) লাভ করে।

১০. বেদনং ফরুসং জানিং সরীরস্স চ ভেদনং,
গরুকং বা'পি অবাধং চিত্তক্খেপং'ব পাপুণে।

বাংলা অনুবাদ : (তার) তীব্র বেদনা, ক্ষয়ক্ষতি, শরীরের অঙ্গাচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি বা চিত্তবিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়।

(সংক্ষেপিত)

দণ্ডবর্গের শিক্ষা

দণ্ডবর্গ পাঠে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। দণ্ডবর্গের শিক্ষামতে, জীবন সকলের কাছে প্রিয়। দণ্ড আর মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়। তাই অপরকে নিজের সঙ্গে তুলনা করে আঘাত বা হত্যা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। নিজের সুখের জন্য যারা অপরকে দণ্ড প্রদান এবং হিংসা করে, তারা পরকালে সুখী হয় না। কাউকে কটু কথা বললে সে-ও কটু কথা বলতে পারে। কটু বা ক্রুদ্ধ বাক্য দুঃখদায়ক। নীরবতা উত্তম মঙ্গল। এতে ক্রোধ প্রশমিত হয়। নির্বোধ ব্যক্তি পাপ কাজ করার সময় পাপের ফল কী হবে, তা বুঝতে পারে না। কিন্তু পাপকর্মের ফলে সে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার মতো যন্ত্রণা ভোগ করে। যে ব্যক্তি নির্দোষ বা নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, সে মৃত্যুর পর নরকে পতিত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি সর্বদা নিজেকে দমন করেন। শান্ত, সংযত হয়ে সকল প্রাণীর প্রতি অহিংস আচরণ করেন।

দণ্ড প্রয়োগ বা শাস্তি দিয়ে অপরাধপ্রবণতা সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব নয়। অপরাধী বা অন্যায়কারীকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারলেই অপরাধপ্রবণতা কমানো সম্ভব। কারও প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। শাস্তি দেওয়ার সময় শাস্তির পরিণাম বিবেচনা করা উচিত। দণ্ডবর্গে প্রতিহিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী প্রদর্শন ও ভালোবাসা দিয়ে অপরাধীকে সৎ পথে পরিচালিত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই সকলের দণ্ড ও হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী প্রদর্শন করা উচিত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৪

সূত্র ও নীতিগাথাবিষয়ক ধারণাচিত্র (concept mapping) ও অভিজ্ঞতা বিনিময় তোমার কেমন লাগল, তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সঙ্গে বিনিমিয় করো।

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?	
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?	

ভবিষ্যতে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় (পরামর্শ)	

ফিরে দেখা : **নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে তারকা (★) চিহ্ন দাও, না হলে না- এর ঘরে ক্রস (X) চিহ্ন দাও।**

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
৩৯		
৪০		
৪১		
৪২		
৪৩		
৪৪		

নয় দণ্ড নয় ভয়
ভালোবাসায় করব জয়।।

নবম অধ্যায়

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা নিতে পারব–

- তীর্থস্থান লুম্বিনী;
- ঐতিহাসিক স্থান সোমপুর মহাবিহার;
- ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।

মিতু বড়ুয়া, রূপা চাকমা, জোনাকী খীসা, মিনুচিং মারমা এবং মিনা তঞ্চঙ্গ্যা খুব ভালো বান্ধবী। তারা প্রতিদিন বিকালে বিহারে প্রার্থনা করতে যায় এবং ভিক্ষুর কাছ থেকে ধর্মকথা শোনে। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবৎ বিহারের ভিক্ষু তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনে যাওয়ায় তারা ভিক্ষুর কাছ থেকে ধর্মকথা শুনতে পাচ্ছিল না। কেবল প্রার্থনা করেই বাড়ি ফিরে যেত। তাই তাদের খুব মন খারাপ। গতকাল তারা বিহারে গিয়ে দেখে ভিক্ষু ফিরে এসেছেন। ভিক্ষুকে দেখে তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এরপর তারা ভিক্ষুকে বন্দনা নিবেদন করে তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে দেশনা করার জন্য অনুরোধ করেন। ভিক্ষু তাদের জানার আগ্রহ দেখে খুশি হয়ে বললেন, ‘‘আমি নেপাল গিয়েছিলাম। লুম্বিনী দর্শন করেছি। আসার পথে বাংলাদেশের সোমপুর বিহারও দর্শন করেছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আজ আমি তোমাদের লুম্বিনী এবং সোমপুর বিহার সম্পর্কে বলব।” পাঁচ বান্ধবী খুবই খুশি হয়ে সাধুবাদ প্রদান করে। তিনি প্রথমে লুম্বিনী সম্পর্কে বললেন।

লুম্বিনী

লুম্বিনী বৌদ্ধদের চার মহাতীর্থ স্থানের অন্যতম। তোমরা জানো, রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বোধিজ্ঞান লাভ করে গৌতম বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান হওয়ার কারণে লুম্বিনীকে বৌদ্ধরা অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে গণ্য করে থাকেন। নেপালের দক্ষিণ সীমান্ত বুটল জেলার ভগবানপুর তহশিলে রুম্মিনদেই নামক স্থানে লুম্বিনী অবস্থিত। সেখানে শ্রীলংকা ও মায়ানমারের ধর্মশালা ও দুটি যাত্রীনিবাস আছে। জাপানের আছে একটি গেস্ট হাউজ। নেপাল সরকারের অতিথিশালা এবং বিশ্ব শান্তি প্যাগোডাও আছে। এছাড়া, চীন, থাইল্যান্ড, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর, কানাডা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের বিহার এবং একটি বুদ্ধিস্ট সেন্টার আছে। লুম্বিনীর প্রধান দর্শনীয় বিষয় হলো অশোক স্তম্ভ ও রুম্মিনদেই মন্দির। সম্রাট অশোক সিদ্ধার্থের জন্মস্থানকে চিরস্মরণীয় ও চিহ্নিত করে রাখার জন্য এখানে একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন। স্তম্ভটির নাম অশোক স্তম্ভ। এই স্তম্ভের জন্য সিদ্ধার্থের জন্মস্থান চিরকালের জন্য স্মরণীয় ও চিহ্নিত হয়ে যায়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রাচীন অশোক স্তম্ভ এবং অশোক অনুশাসন

মায়াদেবী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, দূরে বর্তমানে নির্মিত মায়াদেবী মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ কাহিনি থেকে আমরা লুম্বিনী সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পারি। ভ্রমণ কাহিনি হতে জানা যায়, স্তম্ভটি প্রাচীন মন্দিরের পশ্চিম পাশে ছিল। সেটি ছিল একক পাথরে নির্মিত। স্তম্ভের শীর্ষে শোভা পেত একটি অশ্বমূর্তি। এই অশ্বমূর্তি সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের প্রতীক। স্তম্ভের শীর্ষভাগ এখন ভাঙা।

বর্তমানে পুনর্নির্মিত মায়াদেবী মন্দির

বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা

অশোক স্তম্ভের পাশে আছে লুম্বিনী মন্দির। এটি স্থানীয় লোকের কাছে রুম্মিনদেই নামে পরিচিত। ছোট একটি ঢিবির ওপর এই মন্দির। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে উঠতে হয়। পুরোনো মন্দিরের ভিত্তির ওপর সেটি

নেপাল সরকার আবার নির্মাণ করেন। মন্দিরের উত্তর দিকে গর্ভগৃহের মেঝের সমান পুরোনো মন্দিরটি। ভিতরে সিদ্ধার্থের জন্মচিত্র আঁকা একটি অখণ্ড প্রস্তর ফলক আছে। প্রস্তর ফলকটি সেই প্রাচীনকাল থেকে এখনো টিকে আছে। তবে ফলকে আঁকা চিত্রগুলো একটু ক্ষয়ে গেছে। তাতে সিদ্ধার্থের জননী মায়াদেবী ডান হাতে শালগাছের ডাল ধরে আছেন। পাশে অন্য একজন নারীর চিত্র আছে। সেটি মহাপ্রজাপতি গৌতমীর প্রতিমূর্তি মনে করা হয়। আর এক পাশে কয়েকটি মূর্তি করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এঁদের ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা মনে করা হয়। পিছনে একটি দেবশিশু আছে। সামনের দিকে নিচে একটি পদ্মের ওপর নবজাত সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে আছেন।

লুম্বিনীর এই ঐতিহাসিক স্থানটি বহুদিন মাটির নিচে ঢাকা পড়ে ছিল। স্থানটি চিহ্নিত করে খনন কাজ শুরু হলে সিদ্ধার্থের জন্মচিত্র আঁকা পাথরের ফলকটি অটুট অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর সেটি আবার আগের জায়গায় স্থাপন করা হয়। সেখানে এখন তীর্থযাত্রীরা যেতে পারেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে অশোক স্তম্ভের দিকে যাওয়ার সিঁড়ি আছে। তেমনি পূর্ব দিকে যাওয়ার সিঁড়িও রয়েছে। এরই পাশে আছে একটি প্রাচীন বোধিবৃক্ষ। তীর্থযাত্রীরা এই মন্দিরে পূজা-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

লুম্বিনীর চারপাশে প্রাচীন শাক্য জাতির সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। কালের পরিক্রমায় সেগুলো এখন মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ধ্বংসাবশেষসমূহ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লুম্বিনী খনন ও আবিষ্কারের কাজে তিনজন পুরাতত্ত্ববিদের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন কানিংহাম, কার্লাইল ও ড. ফুলার। ড. ফুলার অশোক স্তম্ভ আবিষ্কার করেন। স্তম্ভের গায়ে লেখা অশোকলিপি পড়ে জানা যায়, এটি সিদ্ধার্থের প্রকৃত জন্মস্থান। সে অনুযায়ী চারদিক খনন করে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

লুম্বিনীর চারপাশে প্রাচীন শাক্য জাতির সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে।

লুম্বিনীর চারদিকে এখন বিশাল বাগান তৈরি করা হয়েছে। বাগানটি বিভিন্নরকম গাছ এবং ফুলে-ফলে। সমৃদ্ধ বাগানের ভিতরে এখন সরকারি ঘরবাড়ি ও অতিথিশালা রয়েছে। পাখির কাকলি আর গাছপালার সৌন্দর্যে লুম্বিনী আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার নামে একটি বিহার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

আমি যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তখন আমার মন অপার আনন্দে ভরে যাচ্ছিল। আমি পুলকিত হচ্ছিলাম। আমার সে সময়ের কথা মনে হচ্ছিল। এক কথায় বলা যায়, আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমরা গেলে তোমাদেরও ভালো লাগবে। তোমরা গুগলে সার্চ দিয়ে লুম্বিনীর বর্তমান অবস্থা, বিশেষত সেখানে কী কী আছে, তা দেখতে পাবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৫

অভিভাবক অথবা কম্পিউটার ল্যাব-এর সাহায্যে কিউ আর কোডটি (QR code) স্ক্যান করে লুম্বিনীতে বর্তমানে কী কী দর্শনীয় বিষয় আছে, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

লুম্বিনীতে দর্শনীয় বস্তুর তালিকা

লুম্বিনীর বর্ণনা শুনে পাঁচ বান্ধবী খুবই উৎফুল্ল হলো। অন্যান্য তীর্থস্থানের বর্ণনা শুনতে তারা আরও আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের আগ্রহ দেখে ভিক্ষু বাংলাদেশের সোমপুর বিহার সম্পর্কে বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন :

সোমপুর মহাবিহার

সোমপুর মহাবিহার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। আমাদের বাংলাদেশেই এই বিহারের অবস্থান। এটি নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। এজন্য বিহারটি পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার নামেও পরিচিত।

এই মহাবিহার এখন আমাদের ইতিহাসের উপাদান। বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও অমূল্য প্রত্ন সম্পদ। কারণ, এটি কেবল ধর্মচর্চার কেন্দ্র ছিল না, অন্যতম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল। এখানে ধর্মচর্চার পাশাপাশি বহু বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাই, এই বিহারকে 'মহাবিহার' বলা হয়। দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীর জন্য এই বিহারের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। শিক্ষার্থীরা নানা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য এই বিহারে আসতেন। তাই বিদেশিদের কাছে এই বিহার বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাত ছিল। আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা এই বৌদ্ধ মহাবিহারগুলো থেকেই হয়েছে।

সোমপুর মহাবিহার প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা বাংলার গৌরবকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক বিক্রমশীলা মহাবিহারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে খ্যাতি আছে।

সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ

সোমপুর মহাবিহার পাল বংশের ইতিহাসের অন্যতম স্মারক। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ঐতিহাসিক মহাবিহার ধ্বংস হয়। সময়ের বিবর্তনে ধ্বংসস্তূপ মাটির নিচে ঢাকা পড়ে যায়। জনসাধারণও ভুলে যায় এই মহাবিহারের কথা। কিন্তু, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ইতিহাস থেকে এটি মুছে যায়নি। ইতিহাসের সেই সূত্র ধরে এটি আবার আবিষ্কৃত হয়। তবে অতীতের গৌরবে ও সৌষ্ঠবে নয়; মাটির গভীর হতে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদরূপে।

এই প্রাচীন বৌদ্ধ মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম অনুসন্ধান করেন স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম। তিনি একজন ব্রিটিশ সামরিক প্রকৌশলী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বৌদ্ধ মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এটির ভূমির আয়তন প্রায় ১১ হেক্টর বা ২৭ একর। এই মহাবিহারের ভবন তৈরি হয়েছে চতুষ্কোণাকার ভূমি পরিকল্পনার মাধ্যমে। এতে আবাসিকদের জন্য ছোটো ও বড়ো ১৭৭টি কক্ষ আছে। যেখানে বসে নিরিবিলি অধ্যয়ন ও সমাধির চর্চা করা হতো। মূল ভবনের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে প্রার্থনা হল, সভাকক্ষ, অধ্যয়নকক্ষ, শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকদের কক্ষ ইত্যাদি। বাংলার গৌরব শ্রী অতীশ দীপঙ্কর খ্রিষ্টীয় দশম শতকে এই মহাবিহার তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। খননের ফলে এই মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপ হতে বহু মূল্যবান বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মহাবিহারের দেয়ালগুলো পোড়ামাটির ফলক চিত্রে শোভিত ছিল। খননের সময় বহু পোড়ামাটির ফলক চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো আমাদের লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাহাড়পুর জাদুঘরে গেলে তোমরা এ মহাবিহার হতে আবিষ্কৃত বহু মূল্যবান প্রত্নসম্পদ দেখতে পাবে।

সোমপুর মহাবিহারে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলক চিত্র

জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা 'ইউনেস্কো'র গবেষণামতে সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো সোমপুর মহাবিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের স্বীকৃতি প্রদান করে। এর মাধ্যমে মহাবিহারটি আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তির মর্যাদা পায়। সোমপুর মহাবিহার বর্তমানে বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অংশ, আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত প্রত্নসম্পদ। এটি সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও পরিদর্শন করে এ সম্পর্কে জানা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশি-বিদেশি বৌদ্ধ ধর্মানুসারী ও পর্যটক নিয়মিত বিহারটি পরিদর্শনে আসেন। এছাড়া গবেষক ও শিক্ষার্থীরাও আসেন এই ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে জানতে। ধ্বংসস্তূপ হলেও এটি জ্ঞানের অন্যতম ভান্ডার।

সোমপুর মহাবিহার সম্পর্কে বলার পর ভিক্ষু পাঁচ বান্ধবীকে তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের উপদেশ দিয়ে দেশনা শেষ করেন। পাঁচ বান্ধবী ভিক্ষুকে বন্দনা নিবেদন এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সন্তুষ্ট মনে বাড়ি ফিরে যায়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৬

কিউআর কোড (QR Code) টি স্ক্যান করে লিংক সংগ্রহ করো এবং সোমপুর মহাবিহার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।

■ ঐতিহাসিক স্থান ও তীর্থস্থানের গুরুত্ব এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা :

বুদ্ধ এবং তাঁর প্রধান শিষ্যদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালের ভারতে গড়ে উঠেছিল বিহার, চৈত্য, সংঘারাম, স্তূপ, স্তম্ভ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কালক্রমে সেগুলো বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান এবং তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করে। ভারতে অবস্থিত বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান এবং তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো : কপিলাবস্তু, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনারা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, ভরহুতস্তূপ, সাঁচীস্তূপ, অজন্তা, ইলোরা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদয়গিরি, রত্নগিরি ইত্যাদি। লুম্বিনীর অবস্থান বর্তমানে নেপালের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাইরে বিশেষত নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি দেশেও গড়ে উঠেছে বহু বৌদ্ধধর্ম চর্চাকেন্দ্র। সেগুলোও ঐতিহাসিক এবং তীর্থস্থান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। ইন্টারনেটে সার্চ বা অনুসন্ধান করলে তোমরা এসব দেশের ঐতিহাসিক ও তীর্থস্থানসমূহ দেখতে পারবে।

বাংলাদেশেও বহু বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : শালবন বিহার, সোমপুর বিহার, আনন্দ বিহার, ভাসুবিহার, হলুদ বিহার, বিক্রমপুর বিহার, জগদ্দল বিহার, কৌটিল্য মুড়া বিহার, রূপবান মুড়া বিহার, ত্রিরত্ন মুড়া বিহার, উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থানগড় ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক ও তীর্থস্থান প্রত্যেক দেশের জাতীয় সম্পদ, গৌরবময় ঐতিহ্য। অতীত ইতিহাস এবং সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। এগুলো বহির্বিশ্বে দেশের গৌরব তুলে ধরে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ঐতিহাসিক ও তীর্থস্থান দর্শনে দেশাত্মবোধ ও ধর্মীয় চেতনা জাগে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়, অর্জিত হয় পুণ্য। এছাড়া, এগুলোর মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আয় হয়। তাই ঐতিহাসিক ও তীর্থস্থানের গুরুত্ব এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনেক।

নানা কারণে এসব স্থান বিনষ্ট হতে পারে। বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চোর বা ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পশু-পাখি-কীটপতঙ্গের উপদ্রব, দর্শনার্থীর উশৃঙ্খল আচরণ প্রভৃতি কারণে স্থানসমূহ নষ্ট হতে পারে। বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে আমরা এ স্থানসমূহ সংরক্ষণ করতে পারি। নিয়মিত যত্ন নেওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সীমানা প্রাচীর দিয়ে পশু-পাখির প্রবেশরোধ, নিয়ম-নীতি মেনে পরিদর্শনের মাধ্যমে আমরা এ স্থানগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। ঐতিহাসিক স্থান ও তীর্থস্থান সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সকলের। তাই এসব স্থান সংরক্ষণের প্রতি সকলের দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৭

ইন্টারনেট সার্চ করে নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি দেশের ঐতিহাসিক ও তীর্থস্থানের একটি ছবির সম্মিলিত তালিকা তৈরি করো।

ছবি	বিবরণ

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান

ছবি	বিবরণ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৮

তথ্যচিত্র এবং তথ্য অনুসন্ধান অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও।

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?

কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

ফিরে দেখা : নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না ঘরে (✔) চিহ্ন দাও :

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
৪৫		
৪৬		
৪৭		
৪৮		

করলে দর্শন ঐতিহাসিক ও তীর্থস্থান, হয় পুণ্য বাড়ে জ্ঞান।।

দশম অধ্যায়

সম্প্রীতি

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব–

- সম্প্রীতি;
- বৌদ্ধধর্মে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির গুরুত্ব;
- সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সুফল।

মানুষ কখনো অপরের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া একা জীবন যাপন করতে পারে না। মানুষকে পরিবার পরিজন নিয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হয়। সমাজবদ্ধ হলে মানুষ নির্ভয়ে, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করতে পারে। এ কারণে প্রতিটি মানুষ নিজের পরিবারের যেমন অংশ তেমনি সমাজেরও অংশ। তাই প্রতিটি মানুষের আছে একটি পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। এটিই মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ নিজের পরিবারের ভালো-মন্দ যেমন চিন্তা করে, তেমনি সমাজ, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় ও দেশের মানুষের কল্যাণের কথাও ভাবে। এই মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ যখন একটি দেশে মিলেমিশে সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে বসবাস করে তখন সৃষ্টি হয় জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে। দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ না থাকলে একটি জাতি সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। জাতীয় উন্নয়নে সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্প্রীতিবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রীতি

সম্প্রীতি মানে হলো অপরের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করা। সব সময় সদ্ভাব বজায় রেখে মিলেমিশে বসবাস করা। প্রীতিময় ও শান্তিময় সহাবস্থান করা। সম্প্রীতি সহাবস্থানের পূর্বশর্ত। সম্প্রীতি এক প্রকার সদগুণ এবং একটি গুরত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই সম্প্রীতিভাব তৈরি হয়। ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে মিলেমিশে জীবন অতিবাহিত করাই হলো সম্প্রীতি। বৌদ্ধধর্মে সম্প্রীতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, 'সমগ্গানং তপো সুখো'। অর্থাৎ, সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকাই উত্তম সুখ। এক সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার মধ্যে বিশেষ আনন্দ আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে। সম্প্রীতি বিনষ্ট হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। নিজের পরিবার এবং সমাজে যেমন সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথেও সম্প্রীতি বজায় রাখা উচিত।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৯

সমাজে সকল মানুষের জন্য কী কী কাজ করা যায়, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

বৌদ্ধধর্মে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির গুরুত্ব

সম্প্রীতির অনুশীলন নিজ থেকেই শুরু করতে হয়। নিজে সংযম, উদারতা এবং সম্প্রীতি চর্চা করলে কারো সঙ্গে কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। সেজন্য সম্প্রীতি রক্ষার জন্য করণীয় আচরণ সম্পর্কে তথাগত গৌতম বুদ্ধ বলেছেন :

> ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞূপরে উপবদেয্যুং,
> সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু, সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এর বাংলা হলো– এমন কোনো ক্ষুদ্র আচরণ করো না, যার জন্য অপর কোনো বিজ্ঞজন নিন্দা করতে পারে। সর্বদা মনে এই চেতনা পোষণ করতে হবে যে, সকলেই সুখী হউক, নির্ভয় হউক, ও মানসিক সুখ ভোগ করুক।

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ আর বলেছেন–

> ন পরো পরং নিকুব্বেথ,
> নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কঞ্চি;
> ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

অর্থাৎ, একে অপরকে কখনো বঞ্চনা করবে না, কাউকে অবজ্ঞা করবে না। এমনকি আক্রোশ বা হিংসাবশত কারো দুঃখ কামনা করবে না।

বৌদ্ধধর্ম মতে, সকলের সঙ্গে সমন্বয় সাধনপূর্ণ সংহতিপূর্ণ আচরণ করা মানুষের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। সংহতিপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে জীবন যাপন করার মধ্যেই প্রকৃত সামাজিক সুখ ও আনন্দ। তাই সকল প্রাণী বা সত্তার সুখ ও আনন্দকে একসূত্রে গ্রথিত করে বুদ্ধ বলেছেন–

> সব্বে সত্তা সব্বে পানা সব্বে ভূতাচ কেবলা,
> সব্বে ভদ্রানি পস্সন্তু মা কঞ্চি পাপমাগমা।

অর্থাৎ, জগতের সকল সত্তা তথা সকল প্রাণী সর্বতোভাবে মঙ্গল দর্শন করুক, কেউ কোনো প্রকার অমঙ্গালের সম্মুখীন না হোক। তিনি আর বলেছেন,

> সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো,
> বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো।

অর্থাৎ এসো, আমরা বৈরীদের মধ্যে অবৈরী আচরণ করি, হিংসাকারীদের মধ্যে এসো আমরা অহিংস হয়ে সুখে জীবন ধারণ করি। তাহলে আমাদের মনে কখনো কোনো ভয়, ভীতি ও শঙ্কা থাকবে না। জীবন হবে শান্তিময় ও মঙ্গলময়। তাই আমাদের জীবনে সম্প্রীতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫০

এখান থেকে যে কোনো একটি কাজের ছবি এঁকে পাশের খালি স্থানে বসাও।

১. অসুস্থ মানুষদের সেবাকাজ।

২. শিশুদের জন্য খাবার পরিবেশন।

এখান থেকে যে কোনো একটি কাজের ছবি এঁকে পাশের খালি স্থানে বসাও।

১. বস্তি এলাকায় শিশু বিদ্যালয় পরিচালনা।

২. অনাথ আশ্রম পরিচালনা।

সাধ্বী মাদার তেরেসা

■ সম্প্রীতি তৈরি করতে মাদার তেরেসার অবদান

জন্ম : মাদার তেরেসা ২৬শে আগস্ট, ১৯১০ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের আলবেনিয়া রাজ্যের স্কপিয়'তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিবার ছিল আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত।

আহ্বান : ১২ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের কাজের জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাকে খ্রিষ্টের কাজ করার জন্য একজন ধর্মপ্রচারক হতে হবে। ১৮ বছর বয়সে তিনি পিতা-মাতাকে ছেড়ে আয়ারল্যান্ড ও পরে ১৯২৯ সালে ভারতে আইরিশ নান সম্প্রদায়ের "সিস্টার্স অব লরেটো" সংস্থায় যোগদান করেন। ডাবলিনে কয়েক মাস প্রশিক্ষণের পর তাকে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ভারতে ১৯৩১ সনের ২৪শে মে সন্ন্যাসিনী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৭ সালের ১৪ই মে চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন।

সেবা কাজ : তিনি কোলকাতার বস্তিতে দরিদ্রতম দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করেন। যদিও তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তিনি বস্তির জন্য একটি উন্মুক্ত স্কুল শুরু করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ৭ই অক্টোবর তেরেসা "ডায়োসিসান ধর্মপ্রচারকদের সংঘ" করার জন্য ভ্যাটিকানের অনুমতি লাভ করেন। এ সমাবেশই পরবর্তীকালে "দ্য মিশনারিজ অব চ্যারিটি" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। "দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি" হলো একটি খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচারণা সংঘ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালে তিনি "নির্মল শিশু ভবন" স্থাপন করেন। এই ভবন ছিল এতিম ও বসতিহীন শিশুদের জন্য এক ধরনের স্বর্গ। ২০১২ সালে এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৪,৫০০ জনেরও বেশি সন্ন্যাসিনী। প্রথমে ভারতে ও পরে সমগ্র বিশ্বে তাঁর এই ধর্মপ্রচারের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরিদ্রদের মধ্যে কার্যকর সহায়তা প্রদান করে থাকে; যেমন– বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অনাথ আশ্রম, স্কুল, মোবাইল ক্লিনিক ও উদ্বাস্তুদের সহায়তা ইত্যাদি। তিনি ৬০ -এর দশকে ভারত জুড়ে এতিমখানা, ধর্মশালা এবং কুষ্ঠরোগীদের ঘর খুলেছিলেন। তিনি অবিবাহিত মেয়েদের জন্য তার নিজের ঘর খুলে দিয়েছিলেন।

তিনি এইডস আক্রান্তদের যত্ন নেয়ার জন্য একটি বিশেষ বাড়িও তৈরি করেছিলেন। মাদার তেরেসার কাজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সময় বিশ্বের ১২৩টি দেশে মৃত্যু পথযাত্রী এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষারোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র, ভোজনশালা, শিশু ও পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়সহ "দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি"র ৬১০টি কেন্দ্র চলমান ছিল।

পুরস্কার : মাদার তেরেসা ১৯৬২ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে "ম্যাগসেসে শান্তি পুরস্কার", ১৯৭২ সালে "জওহরলাল নেহেরু পুরস্কার" এবং ১৯৭৮ সালে "বালজান পুরস্কার" লাভ করেন। মাদার তেরেসা ১৯৭৯ সালে দুঃখী মানবতার সেবাকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ "নোবেল শান্তি পুরস্কার" অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে পান ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা "ভারতরত্ন"। ১৯৮৫ সালে তিনি "প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম পুরস্কার" লাভ করেন। ২০১৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে একটি অনুষ্ঠানে পোপ ফ্রান্সিস তকে "সন্ত" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ক্যাথলিক মিশনে তিনি "কোলকাতার সন্ত তেরেসা" নামে আখ্যায়িত হন।

মৃত্যু : তিনি ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ ৮৭ বছর বয়সে কোলকাতার পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন।

সদাচারের মাধ্যমে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সৌহার্দ ও সম্প্রীতি চর্চার অনেক সুফল রয়েছে। যেমন–

সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সুফল

১. মানুষ সুখে-শান্তিতে নির্ভয়ে বসবাস করতে পারে।
২. নিজের কল্যাণ কামনার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রাণীরও কল্যাণ কামনা করে।
৩. সকল মানুষকে কল্যাণমিত্র হিসেবে বিবেচনা করে।
৪. সকল মানুষ ও প্রাণীর প্রতি মৈত্রীময় আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।
৫. হিংসা-বিদ্বেষ এবং ভেদাভেদ দূর হয়।

যাদের মনে হিংসা-বিদ্বেষ-ক্রোধ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি থাকে তারা শত্রুহীন হয়ে সুখে বসবাস করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন :

অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে’,
যে চ তং ন উপনয্হন্তি, বেরং তেসং ন সম্মতি।

অর্থাৎ, ‘যারা আমাকে তিরস্কৃত, প্রহৃত ও পরাজিত করল এবং আমার সম্পদ হরণ করল’– এরকম চিন্তা পোষণ করে, তাদের বৈরীভাব কখনো প্রশমিত হয় না। তাই বুদ্ধ সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ-ক্রোধ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাসের উপদেশ দিয়েছেন।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর বাণীতে কোনো নির্দিষ্ট জাতি, ধর্ম সম্প্রদায় বা ব্যক্তির কথা বলেননি। তিনি সর্বক্ষেত্রে সর্ব সত্তার কথা বলেছেন। সর্বজনীন মঙ্গলের কথা বলেছেন। তাঁর বাণীর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ আন্তরিকতা প্রদর্শনের কথা বলা হয়নি। সকল ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, জাতি, গোষ্ঠী তথা মানবজাতিসহ সকল প্রাণীর প্রতি সর্বতোভাবে অন্তঃপ্রাণ ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ সকলের মধ্যে আন্তরিক ও প্রাণের সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের উচিত সম্প্রীতি চর্চার মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আন্তরিক ও মানবিক সম্পর্ক তৈরি করা, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা। তাহলে আমরা সকলে সুখে-শান্তিতে নির্ভয়ে বসবাস করতে পারব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫১

সম্প্রীতি তৈরি করতে করণীয় সম্পর্কে একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করো। কর্ম-পরিকল্পনাটি নিজ বিদ্যালয় বা পরিবারে প্রয়োগ করো। যেমন– শ্রেণিকক্ষ বা বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, সেবামূলক কর্মকাণ্ড, পরিবারে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

এসো সম্প্রীতি গড়ি

সুখে-শান্তিতে বসবাস করি।।

মেট্রোরেল (নির্মাণাধীন)

"বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ
যানজট কমাবে মেট্রোরেল"

এই রূপকল্পকে সামনে নিয়ে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল সিস্টেম। এই মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার এবং তা দুইদিক থেকে ঘণ্টায় প্রায় ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। মেট্রোরেলের মাধ্যমে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দ্রুত পৌঁছানো যাবে এবং তা যানজট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং পরবর্তীতে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেলের কাজ চলমান আছে। এছাড়া আরও পাঁচটি রুটে মেট্রোরেল নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৭ম শ্রেণি
বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।
- গৌতম বুদ্ধ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ‘৩৩৩’ কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য